KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No.: KLMLGK 2007	Place of Publication: ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection: KLMLGK	Publisher: মীর রহমান
Title: চতুরঙ্গ	Size: 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ৫১/১ ৫১/2 ৫১/৩ ৫১/৪	Year of Publication: বৈশাখ ১৩৯৭ ॥ May 1990 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭ ॥ Jun 1990 আষাঢ় ১৩৯৭ ॥ July 1990 শ্রাবণ ১৩৯৭ ॥ Aug 1990
	Condition: Brittle / Good ✓
Editor: আব্দুর রউফ	Remarks:

C.D. Roll No.: KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫১ সংখ্যা ২ জুন ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

হিন্দু-মুসলমানের ঐতিহ্যকে পৃথক করে দেখলে ভারতীয়ত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যে অসম্ভব—এই প্রত্যয় উদ্ভাসিত হয়েছে প্রবীণ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের "হিন্দু-মুসলমান কী জয়"—সন্দর্ভে।

সমাজতাত্ত্বিক শ্রীনিবাসের "কর্তৃত্বকারী জাত" এবং "সংস্কৃতায়নের ধারণা" নিয়ে লিখেছেন ড. ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"শব্দের অমোঘ শর ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলীচিন্তা" নিবন্ধে সামাজিক উপযোগবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের শৈলীচিন্তার সুনির্দিষ্ট কাঠামোকে চিহ্নিত করেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ভাষাতাত্ত্বিক পবিত্র সরকার।

যুগোপযোগী চিন্তাপ্রসূত বঙ্কিম-সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ।

"কাজী নজরুল—স্মৃতির পাতা থেকে"—প্রয়াত ড. সুধীর সেনের এই লেখায় এমন কিছু তথ্য এবং ভাষ্য আছে যা নজরুলচর্চাকে করে তোলে সমৃদ্ধতর।

"সবুর বিহনে" সমাজতন্ত্রের ফুল ফোটাতে গিয়েই কি কমিউনিস্টদের আজ যত সমস্যা?—এই নিয়ে তর্কসাপেক্ষ ভাষ্য।

একাডেমি এবং আনন্দপুরস্কারপ্রাপ্ত "সার্কল অব রিজন" আর "শ্যাডোলাইনস্" এর লেখকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মূল্যবান মতামত।

"অলকানন্দার পুত্রকন্যা"—নিয়ে আলোচনা।

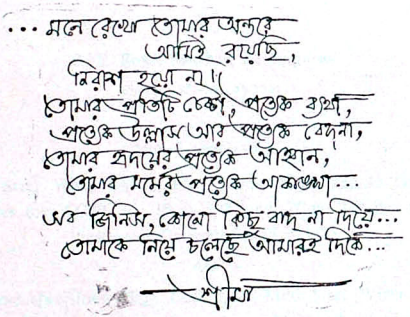

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৫১। সংখ্যা ২
জুন ১৯৯০
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭

"হিন্দু-মুসলমান-কী জয়!" হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮১
শব্দের অমোঘ শর: বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলীচিন্তা পবিত্র সরকার ৮৭
কাজী নজরুল—স্মৃতির পাতা থেকে সুধীর সেন ১০৫

ব্রহ্ম হরপ্রসাদ মিত্র ১০১
দূরে কোথাও যাওয়া বিপ্লব মাজী ১০২
বিষ রমেন আচার্য ১০৩
রাত্রির মানুষ সুব্রত সরকার ১০৪

রদবদলের পৃথিবী সাধন চট্টোপাধ্যায় ১১৩

গ্রন্থসমালোচনা ১২১
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, মেঘ মুখোপাধ্যায়,
সুলেখা আচার্য

আলোচনা ১৩৫
পিছিয়ে-থাকা সমাজে সমাজতন্ত্র গড়ে-তোলা অক্ষয় কর্মকার

সাক্ষাৎকার ১৪২
অন্তরঙ্গ অমিতাভ ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

নাটক ১৫০
"অলকানন্দার পুত্রকন্যা" মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

মতামত ১৫২
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কল্যাণকুমার দত্ত

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

CALCUTTA STEEL COMPANY LIMITED

"STEEL HOUSE"

20, HEMANTA BASU SARANI □ CALCUTTA-700 001

Manufacturers of :

STEEL BARS □ RODS □ WIRE RODS □ COLD TWISTED DEFORMED BARS AND FLATS.

"হিন্দু-মুসলমান-কী জয় !"

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশের নানা অঞ্চলে যখন বেশ কিছুকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের আগুন জ্বলছে, কাশ্মীরের মতো এলাকা যখন বিস্ফোরক অবস্থায় রয়েছে, 'রামজন্মভূমি'-বাবরি মসজেদ বিতর্ক নিয়ে বিষময় বিপদের আশঙ্কা দূর হবার লক্ষণ যখন নেই, বাক্‌স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে যখন দাপটের সঙ্গে উগ্র হিন্দু ঘোষণা চলছে যে, অযোধ্যার মতো মথুরা এবং বারাণসীতেও বিধর্মীদের হটিয়ে মন্দির বানানো হবে, ভারতীয় জনতা পার্টির মতো অধুনা শক্তিশালী সংগঠন যখন অবলীলাক্রমে বলে চলেছে যে মুসলমান এদেশে বহিরাগত বলে হিন্দু পরম্পরার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে না পারলে তার নাগরিক অধিকার ভারতরাষ্ট্রে স্বীকৃত হবে না, যখন ভাগলপুরের মতো অঞ্চলে একেবারে অভাবনীয় ধরনের সাম্প্রদায়িক নৃশংসতা শুধু নয়, অন্য বহু স্থানে বার-বার সংখ্যালঘু মুসলমান আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে, এমনকী খাস রাজধানী দিল্লীতেই হজরত নিজামউদ্দীন দরগার মতো সকলধর্মাবলম্বীরই আদৃত তীর্থস্থান পর্যন্ত এই কলুষ থেকে নিস্তার পায় নি, "হিন্দু-মুসলমান-কী জয়" উচ্চারণ কি বিদ্রূপ না পরিহাস না নিছক ভাবাবেগী নিরুদ্ধিতা ?

সন্দেহ নেই যে, সম্প্রতি জগৎ জুড়ে এমন অনেক বিচিত্র আর আপাত-দৃষ্টিতে বিকট বিপর্যয়কর ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে আর সমাজশৃঙ্খলার জন্য প্রশংসিত সোশালিস্ট দুনিয়াতে মারাত্মক ওলটপালটের লক্ষণ প্রকট হয়েছে যে মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোকে মহাপাপ বলে জীবনান্তের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ঋষিকণ্ঠোক্ত সতর্কবাণীর আশ্রয় ছাড়া যেন উপায়ান্তর নেই। আজকের পরিস্থিতি মাঝে-মাঝে এমন কটু আর কুৎসিত বীভৎসতার আকার নিয়ে চলেছে যে নৈরাশ্য দেখা দিলে আশ্চর্য নয়, কিন্তু আমাদের দেশের মানুষের মনের গভীরে প্রচণ্ড প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে শুভবুদ্ধির যে বিপুল সঞ্চয় আছে তা স্মরণে রাখলে নৈরাশ্য পরাভূত হতে বাধ্য।

হয়তো ভাববাদী বিভ্রমের অভিযোগ শুনতে হবে, কিন্তু মনে পড়ছে *'The Indian Musalmans'*-শীর্ষক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের রচয়িতা মনস্বী মুহম্মদ মুজীব-এর একটি কথা। পাটনার নিকটবর্তী একটি ছোটো শহরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মর্মান্তিক মালিন্য তাঁর মন থেকে মুছে গিয়েছিল যখন তিনি দেখেন কয়েকজন হিন্দু মেয়েকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে জলের কলসী নিয়ে গঙ্গাকূলে অবস্থিত "সূফী" ধর্মস্থান প্রদক্ষিণ করতে। মনে পড়ে যাচ্ছে সত্তর বৎসরেরও বেশি আগের খবর যা সংবাদপত্রমাধ্যমে জেনে সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়েছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগে হতাহতদের মধ্যে পড়ে থাকা মুসলিম কিশোর তৃষ্ণায়

জর্জর হয়েও বলে উঠেছিল : 'একটু জল! না, দাও আমার পার্শ্ববর্তীকে, আমি চলি, হিন্দু-মুসলমান কী জয়!'

পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটছি বলে উন্নাসিক ভর্ৎসনাকে না হয় উপেক্ষা করে গান্ধীজীর অবিস্মরণীয় সাপ্তাহিক "ইয়ং ইনডিয়া" (৮ সেপটেম্বর ১৯২০) থেকে একটু উদ্‌ধৃতি দেওয়া যাক। 'মাদ্রাজ শফরের সময় বিজয়-ওয়াড়াতে সভায় শ্রোতাদের বলেছিলাম যে ব্যক্তির বদলে আদর্শের জয়গান সমুচিত আর তাই "মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়", "মুহম্মদ আলী-শৌকৎ আলী কী জয়"-এর বদলে ধ্বনি উঠুক "হিন্দু-মুসলমান কী জয়।" আমার পর বলতে উঠে ভাই শৌকৎ আলী একেবারে সোজাসুজি বললেন যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সত্ত্বেও তিনি লক্ষ করেছেন যে হিন্দুরা "বন্দেমাতরম্" বললেই পাল্লা দিয়ে মুসলমানরা বলে উঠেন "আল্লা-হো-আকবর" কিংবা এর উলটোটা ঘটে, যা কানে খারাপ লাগে আর ভয় হয় যে দেশের মানুষ ঠিক এক হতে পারে নি। এজন্যই তাঁর সুপারিশ হল যে সর্বত্র স্বীকৃত হোক তিনটি "আওয়াজ"—প্রথমে 'আল্লাহ্-হো-আকবর' যা হিন্দু-মুসলমান সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করবেন, 'ঈশ্বর মহান' বলতে কারও আপত্তি যখন নেই ; দ্বিতীয় ধ্বনি হবে 'বন্দেমাতরম্' কিংবা 'ভারতমাতা কী জয়' ; আর তৃতীয়টি হবে 'হিন্দু-মুসলমান কী জয়' (যা বিনা লড়াইয়ে জয় সম্ভব নয়)। আমি [গান্ধীজী] মওলানা সাহেবের প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিচ্ছি।···শুধু 'ভারতমাতা কী জয়'-এর বদলে পছন্দ করি 'বন্দেমাতরম্', কারণ তা হবে গোটা দেশের পক্ষে বাঙলার বিদ্যাবুদ্ধি ও আবেগ-গত উৎকর্ষের মনোরম স্বীকৃতি।···হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য বিনা সবই অসার্থক আর তাই "হিন্দু-মুসলমান কী জয়" এমন এক ধ্বনি যা আমরা যেন কখনও না ভুলি।'

বিদগ্ধ বিচারে গান্ধীজীর এই বিবৃতিতে হয়তো অনেক গলদ ধরা পড়বে। মজা করে বলা যেতে পারে যে, মহাত্মা হলেও রাজনীতি ব্যাপারে চাতুর্যেরও অধিকারী গান্ধীজী বাঙলাকে একটু তুষ্ট করারও চেষ্টা করেছিলেন। শুধু আওয়াজ তুলে, আবেগের কুহেলিকা তৈরি করে বাস্তব সমস্যার সমাধান অবশ্য ঘটে না, কিন্তু সেদিনের উন্মাদনা যাদের স্মরণে আছে, অন্তত কিছুকাল স্বাধীনতার সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব ঐক্যের মনমাতানো সেই আস্বাদ যারা কখনও ভুলবে না, তারা জানে যে বাস্তবিকই তখন এমন এক সুযোগ এসেছিল যা (গান্ধীজীরই ভাষায়) আগামী একশ বছরে আসবে কিনা সন্দেহ! এখানে সম্ভব নয় সংক্ষেপে সেই ইতিহাস বিবৃত করা যা চোখে আঙুল খুঁচিয়ে দেখিয়ে দিল আমাদেরই নিজস্ব বহু প্রজন্মপুষ্ট দুর্বলতা যা কিছুতেই ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের কুটিল দুরভি ভেদনীতির প্রবল প্রয়োগকে পরাজিত করতে পারল না, আর শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের মতো মারাত্মক মূল্য দিয়ে কিনতে হল খণ্ডিত স্বাধীনতা, যে-মূল্য আজও সুদে-আসলে পরিশোধ সম্পূর্ণ হয় নি, যেজন্যই কাশ্মীর জ্বলতে থাকে, পনজাবে বিকট অশান্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসে, আর দেশ জুড়ে সংহতিভঙ্গের নোংরা আবহাওয়া কাটানো যায় না। ১৯৩০ সালে মওলানা মুহম্মদ আলী লনডনে গোলটেবিল সম্মেলনে পরম দুঃখেই বলেন : 'আমরা নিজেরা ভাগাভাগি করছি আর তোমরা শাসন করছ' ('We divide and you rule')। এ যে কত মর্মন্তুদ উক্তি তা এযুগের অনেকেই হয়তো বুঝবেন না।

হাল ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই অবশ্য ওঠে না, কারণ অন্ধকারের মধ্যেই আলোকের দীপ্তি এখনও দেখা যায়। যেখানে জনশক্তি একটু জাগ্রত সেখানেই 'দানবের সাথে সংগ্রামের তরে' প্রস্তুতিও রয়েছে। রামজন্মভূমি নিয়ে উত্তেজনা যে এলাকায় চরমে উঠেছিল সেই অযোধ্যারই ফৈজাবাদ নির্বাচনকেন্দ্র থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কংগ্রেস দলের অশুভ সংযোগ সত্ত্বেও বিপুল ভোটে লোকসভায় নির্বাচিত হলেন সি.পি. আই. প্রার্থী মিত্রসেন যাদব।

কানপুরের মতো যেখানে হিন্দু-সংকীর্ণতার ঢেউ ছিল প্রবল, সেখানেও সি. পি. আই. (এম)-এর পক্ষ থেকে লোকসভায় গেলেন সুভাষিণী আলি। বিহারে যখন রাজনীতিওয়ালাদের অবিশ্বাস্য দায়িত্বহীনতা আর দুর্নীতিপরায়ণতার ফলে ভাগলপুরে নৃশংস অচিন্তনীয় পৈশাচিকতার তাণ্ডব চলেছিল, তখনই ধানবাদের মতো দুর্বৃত্ত-শাসিত বলে কুখ্যাত এলাকা থেকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করলেন কমিউনিস্টমতাবলম্বী এ. কে. রায়ের মতো নির্বিত্ত অথচ জনপ্রিয় কর্মী। অতিবর্ষণের মধ্যেই রামধনুর স্বর্ণ আবির্ভাবের মতো হল এ-ধরনের ঘটনা। মনে পড়ছে কিছুকাল আগে মীরট-মালিয়ানার বীভৎস দাঙ্গার মধ্যে ছোট্টো একটা খবর যাকে খবরের কাগজ স্থান দেবার যোগ্য মনে করে নি (দেখেছিলাম স্বেচ্ছায় রক্তদান-সমিতির এক বিবরণে) —সাংঘাতিক জখম এক হিন্দুর প্রাণ বেঁচেছিল মুসলমান চিকিৎসকের নিজের (এক বিরল শ্রেণীর) রক্তদানের ফলে। আজ যারা "হিন্দুত্ব"-র দর্প নিয়ে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে আর ভ্রূক্ষেপ না করে দেশের শান্তি শুধু নয়,—তার সত্তা তার মর্যাদা আর স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেবার মতো মূঢ়তায় মগ্ন হয়ে রয়েছে, তারা হয়তো জানে না বা জানতে চায় না যে স্বাধীন ভারতে প্রথম "মহাবীরচক্র" পেয়েছিলেন ব্রিগেডিয়ার মুহম্মদ উসমান (যাঁর ভাই প্রয়াত সাংবাদিক সুভান ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু)—তিনি প্রাণ দিয়েছিলেন কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধে। ক-জনই বা জানেন যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিসংঘর্ষকালে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রাণ দেন হাবিলদার আবদুল হামিদ খান, মরণোত্তর সম্মান দেশ জানিয়েছিল তাঁর স্মৃতিতে "পরমবীরচক্র" উৎসর্গ করে। আমাদের এদেশ যে একইভাবে হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি-কর্মভূমি-পুণ্য-ভূমি—বলেন নি কি মওলানা আবুল কালাম আজাদ যে দেশ ভাগ হয়েছে ভূগোলে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ে তো নয়? বলেন নি ১৯৪০ সালের সভায় পাকিস্তান-বিষয়ক বিতর্কে কলকাতার তৎকালীন মেয়র আবদুর রহমান সিদ্দীকি (যাঁর কথা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে স্বকর্ণে শুনেছিলাম বলে আজও যেন শুনতে পাই) যে রাষ্ট্রের সীমানার অদলবদল ঘটলেও এদেশ তো হিন্দু-মুসলমান সকলের, আর এটাকেই ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে বলেছিলেন যে মৃত্যুর পর হিন্দুর শবদেহ ভস্ম হয়ে নদীর জল বেয়ে কোথায় যায় কে জানে, কিন্তু মুসলিম তার মৃত্যুর পরও চায় এদেশেরই জমিতে একটু স্থান, শুধু জীবনে নয় মরণেও মুসলিমের দেশ হল এই ভারতবর্ষ।

এর পিছনে যদি কেউ শুধু আবেগ আর উচ্ছ্বাস আর বাক্‌সর্বস্বতা খুঁজে খুশি হন তো নাচার। কিন্তু ভাবি শান্তিনিকেতন-খ্যাত প্রয়াত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর "হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা" ও অন্যান্য রচনা তথ্যসম্ভার-সুরভিত হয়ে কত জ্ঞান আর অনুরক্ত আনন্দ বিতরণ করার ক্ষমতা রাখে! একেবারে সদ্যঃ-প্রকাশিত "মানবতা ও গণমুক্তি"-র মতো গ্রন্থে এবং অন্যত্র বাঙালির সাহিত্যে ও জীবনে বিবর্তনধারার গভীর বিশ্লেষক, বাংলাদেশের প্রমুখ মনস্বী আহমদ শরীফ সমাজসৃষ্ট ব্যবধান সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের সহজ সুস্থ স্বাভাবিক সাযুজ্য বিষয়ে মহার্ঘ অন্তরদৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মুসলমান তো এদেশের বহিরাগত নয়। তারা তো প্রায় সবাই এদেশেরই প্রাচীন সমাজশাসনে নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষ যারা ধর্মভাষাজাতিনির্বিশেষে যুগ-যুগ ধরে নির্জিত হয়ে এসেছে। এজন্যই তো দেখি পৈশাচিক অত্যাচার শুধু ধর্মের ভিত্তিতে নয়, হিন্দু সমাজের একেবারে নীচের তলায় যারা পিষ্ট রিক্ত অমানবিক জীবনযাপনে বংশানুক্রমে বাধ্য হয়েছে তাদেরও সইতে হচ্ছে শক্তিমান গোষ্ঠীগুলির দৌরাত্ম্য। জাতিধর্মভাষা-নির্বিশেষে 'সর্বে জনাঃ সুখিনো ভবন্তু' বাক্যটি কবেযে সর্বদেশে সত্য হয়ে উঠতে শুরু করবে তা জানি না কেউ, কিন্তু এজন্য যে লড়াই তার চেয়ে সার্থক প্রয়াস তো নেই। এই প্রয়াসেরই অংশীভূত হওয়ার চেয়ে

সুকর্ম আর কী আছে?

বাঙালি আমরা বিশেষ করে কেন এখনও সবাই পারি নি অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রহণ করতে যে আমাদের জীবনে আর ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান একত্র থেকেই সৃষ্টিশীলতাকে প্রকাশ করতে পেরেছি। স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় মাতৃভাষার প্রতি বহুগুণ বিপুল আর গভীর মমতা দেখি না কি বাঙালি মুসলমানের মনে? ব্রাহ্মণপণ্ডিতের দল স্মৃতিশাস্ত্র চর্চায় ব্যস্ত থেকে যখন বিধান দেয় যে দেবভাষা সংস্কৃত ছেড়ে অপোগণ্ড বাঙালির মাতৃভাষায় রচনায় প্রবৃত্ত হলে রৌরব-নরকপ্রাপ্তি অনিবার্য তখন হুসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাগল খানের মতো মুসলিম শাসকের সুবুদ্ধি ও উৎসাহ বিনা মধ্যযুগীয় বাঙালির নিজস্ব সাহিত্য বলতে কিছু থাকত মনে হয় না। এ নিয়ে কথা বাড়ানোর দরকার নেই, কিন্তু কজন আমরা জানি যে চণ্ডীদাস যেমন লেখেন: 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই', তেমনই পরবর্তী যুগে কাজী দৌলতের মুখে শুনি: 'নর সে পরম দেব / নর সে ঈশ্বর / নর বিনা ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর'? কজনের মনে আসে 'রামচরিতমানস'-এর স্রষ্টা মহাত্মা তুলসীদাসেরই সমসাময়িক বিরাট লেখক মালিক মুহম্মদ জৈসি-কৃত "পদ্মাবত"-এর কথা যাকে অবলম্বন করে বাঙালি মহাকবি আলাওল লেখেন "পদ্মাবতী" (সঙ্গে-সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-সমেত অন্যান্য বহু বিষয়ে লিখতেও আলাওলের আটকায় নি)?

রাজসভাকবি এবং সর্ব অর্থে বিদেশাগত বলে অভিজাত জীবনে আশ্রয় নেওয়া যাঁর পক্ষে সহজ ও সঙ্গত হত, সেই আমির খসরু-র মতো বিস্ময়কর সর্ববিদ্যাপারংগম প্রতিভা সাত শ বছরেরও বেশি আগে এদেশের মানুষ যেভাবে বনে গিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর নিশ্চয়ই, কিন্তু ভারত-ইতিহাসের "যজ্ঞশালায়" এ-ঘটনা জাজ্জ্বল্যমান নয়, সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তবিকই সুসমঞ্জস। হজরত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য ছিলেন এই মহাকবি-সাংগীতিক-রূপস্রষ্টা। নিজামউদ্দীন-প্রতিষ্ঠিত দরগার এক প্রধান বুঝি বলতে সংকোচ করেন নি যে 'হিন্দোস্তানকো দো পয়গম্বর, রাম অওর কৃষ্ণ'। আমির খসরু তো সানন্দে বলতেন তিনি 'তুর্ক' নন, তিনি 'হিন্দভি'! 'ভারতীয় তুর্ক' তাই বলতেন যে এদেশ গরম নিশ্চয়ই, কিন্তু কারণটা কি কেউ জানে? সূর্য যে ভালোবাসে এই দেশকে! আর এখানকার ফুল! যেমন তার রঙ তেমনই তার গন্ধ, আরবের ফুল তার ধারে-কাছে আসে না! সাহিত্য-সংগীত-শিল্পকলার সর্ব বিভাগে বিপুল গুণধর এই মানুষটিকে হিন্দি ভাষার একজন স্রষ্টা বললে ভুল হয় না। আর খিল্‌জি রাজবংশের সভাকবি হয়েও তাঁর লিখতে আটকায় নি যে, 'বঞ্চিত দরিদ্রের অশ্রুজল জমাট হয়ে তৈরি হয়েছে মুক্তা যা কিন্তু শোভা পায় ধনীর কণ্ঠে।' আজও হয়তো পান-খেকো বাঙালি খুশি হবে এই বিরাট প্রতিভার মুখে খাওয়ার পর পানের মতো অপরূপ বস্তু চিবোনোর মহিমা কীর্তিত হতে শুনে!

মুসলমান এদেশে রাজ্যজয়ে আসার বহু পূর্বে মুসলমান সাধকেরা আসেন, দক্ষিণ ভারতের বহু স্থলে তাঁরা পীঠ স্থাপন করেন যা আজও রয়েছে। হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে ভক্তের দল যেখানে প্রণতি জানায়। যেমন নানকদেব ("হিন্দুকা গুরু, মুসলমানকা পীর"), তেমনই বাবা ফরীদ-এর মতো মুসলমান সাধুকে বলা যায় পনজাবি (এবং সিন্ধি) ভাষার জনক। ওই দুই ভাষায় আর-এক স্রষ্টা ছিলেন শাহ আবদুল লতীফ। ভাষাভেদবুদ্ধি যখন প্রকট হয় নি তখন লেখা হয় আলী হায়দর এবং তার চেয়েও বিখ্যাত ওয়ারিস শাহ র "হীর-রঞ্ঝা"-র মতো প্রেমগাথা যা সারা উত্তর ভারতের হৃদয় জয় করে রেখেছে আজও। কাশ্মীরে (বর্তমানে সংকট সত্ত্বেও) হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে যে সৌহার্দ্য যুগ-যুগ ধরে দেখা দিয়েছে তাতে সহায় হয়েছিলেন "কাশ্মীরের আকবর" নামে খ্যাত নরপতি জৈনুল আবেদিন। আকবর বাদশাহ শুধু যে 'দীন্ ইলাহি' প্রবর্তনচেষ্টার দুঃসাহসে নেমেছিলেন তা নয়, তিনি স্বেচ্ছায় সানন্দে তৎকালীন জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের রামায়ণ-মহাভারতের বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে ডেকেছিলেন, যা "আকবরনামা"-র অন্তর্ভুক্ত হয়তো হয়েছিল, কিন্তু যতদূর জানি তার সন্ধান পাওয়া যাবে ব্রিটেনে (আন্ধ্রপ্রদেশের জয়পুর-মহারাজার প্রাসাদে বুঝি এককালে সেগুলি ছিল)। অনেকেই অবশ্য জানি কিন্তু তাৎপর্য বুঝি না যে, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারা শিকোহ্ এদেশের সর্বশাস্ত্রমন্থনের ব্রত নিয়েছিলেন, "সত্যস্য সত্যং" বলে যার বর্ণনা সেই উপনিষদের অনুবাদ ও প্রচারে নেমেছিলেন, রচনা করেছিলেন "মহাসমুদ্রের সম্মেলন" আখ্যার মহাগ্রন্থ। সুপণ্ডিত কে. এম. পানিক্কর একবার লেখেন যে দারা শিকোহ্-র এই কীর্তি হল 'বিশ্ব ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্ত', ভারতবর্ষে ইসলামের আবির্ভাবের অবিস্মরণীয় মিলন-নিদর্শন। হয়তো এজন্যই দেখা যায় যে, এদেশে ঠিক ইয়োরোপের ধাঁচে না হলেও ধর্ম নিয়ে যুদ্ধ যে ঘটে নি তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বড়ো কথা এই যে সর্বত্র সাধুসন্ত সূফী-দরবেশ যুগে-যুগে মনুষ্যমহিমা ও মৈত্রীর বাণী বহন করে চলেছেন, আর এটা ঘটতে পেরেছে কারণ প্রথমে অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর বিদেশাগত হলেও মুসলমান মিশে গিয়েছে এদেশের মাটিতে মননে আবহে এমনভাবে যার তুলনা ইতিহাসে দুর্লভ। এজন্যই আমাদের বন্ধু হুমায়ুন কবির একবার কোনারক মন্দিরকে বলতে পেরেছিলেন 'হিন্দুতাজ' (কথাটা নিয়ে সস্তা বিদ্রূপ বর্জনীয়)। এজন্যই শিল্পক্ষেত্রের সর্বত্র, শুধু সাহিত্যে নয়, স্থাপত্যে, চিত্রকলায়, সংগীতে, বিধিবিধানে, সামাজিক আদবকায়দায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, এমনকী রন্ধনব্যাপারে, সর্ববিধ সৃষ্টিকর্মে মুসলমান এদেশে বিদেশী কখনও থেকে যায় নি। স্থাপত্যে বিশেষ করে ইন্দো-মুসলিম কীর্তির স্বকীয়তা বিশ্বের অন্যান্য যেদেশে মুসলমান প্রভাব পড়েছে তার তুলনায় স্পষ্ট ও কেমন যেন এক বিশিষ্ট ভারতগরিমায় মণ্ডিত। 'মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে', এই কবিবাক্য এখানে মনে পড়বে। হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা এভাবেই সম্ভব হয়েছে—তার ক্রমবর্ধমান সার্থকতার পথে বিঘ্ন সাম্প্রতিক যুগে দেখা দিয়েছে অশুভ কারণসমাবেশে, যার মোকাবিলায় ব্যর্থ হলে সকলেরই ক্ষতি।

উল্লেখ করতেই হয় মধ্যযুগ বলে অভিহিত কালের ভক্তি-আন্দোলন যা দক্ষিণ ভারতের শৈব ও বৈষ্ণব সাধুদের রচনা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম সূফী ও অন্যান্য মরমি চিন্তার সঙ্গে যার নিবিড় সম্পর্ক। মহারাষ্ট্রে জ্ঞানেশ্বর থেকে তুকারাম, পূর্ব ভারতে শ্রীচৈতন্য, শঙ্করদেবের মতো মহাপুরুষের তখন আবির্ভাব। গুজরাতে মীরাবাঈ, উত্তরে নানকদেব (যিনি "গ্রন্থসাহিব"-এ কোরান, হিন্দুধর্মশাস্ত্র ও কাব্য ইত্যাদি থেকে বহু রত্ন সঞ্চয়নের নির্দেশ দেন) থেকে রামানন্দ আর তাঁরই শিষ্য-প্রশিষ্য। যাদের মধ্যে দেখা যাবে নাপিত, কামার, জোলা প্রভৃতি নিম্নবর্গের মহাত্মাকে। কে-না জানে হিন্দু-মুসলমানের কাছে সমভাবে পূজিত, 'ভারত-পন্থ'-এর প্রোজ্জ্বল প্রবক্তা মহাত্মা কবিরকে। যাঁর অপরূপ কাব্যরসে ভরপুর "দোহা"-র তুলনা নেই, 'অধিক সেয়ানা' 'ধর্ম-বাণিজ্যক'-দের যিনি ধিক্কার দিয়েছেন, 'হিন্দুকো হিন্দ্‌বাই দেখি, তুর্কন্‌কো তুর্কাই' বলে ক্ষোভ জানিয়েছেন, আর অবিস্মরণীয় মহিমায় বিরাজ করছেন ভারত মানসে। সেখানে যেমন আছেন তুলসীদাস আর সুরদাস, তেমনই আছেন রবিদাস, দাদু দয়াল, বাবভান, রজ্জব-এর মতো মহাপুরুষ। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়বে মৈনুদ্দীন চিস্তি, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, শাহ জালাল, শাহ কলন্দর, বাহাউদ্দীন জাকারিয়া প্রভৃতি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বকে। ধর্মধ্বজী বলে এঁদের অসম্মান করার দুর্বুদ্ধি যেন না ঘটে। ইতিহাস বলে (এবং মার্কস-এঙ্গেলস-এর বহু রচনায় তার পূর্ণ স্বীকৃতি) যে একদা ধর্মকে অবলম্বন করেই বঞ্চিত মানুষের লড়াই সম্ভব হয়েছে। মার্টিন লুথর-এর বিশ্বখ্যাত সঙ্গীত 'A

sure stronghold our God is still'-কে এঙ্গেলস বর্ণনা করেছিলেন 'The Marseillaise of the 16th century' বলে।

আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিবেশে মৌলিক পরিবর্তন শুধু তত্ত্বকথার জোরে আসতে পারে না। কিন্তু তত্ত্ব আর কর্মের সমাবেশে সৃষ্ট হয় অপরাজেয় জনশক্তি। জীবনের বাস্তব ব্যস্ততার মধ্যেই জীবন পরিবর্তনের পথ ও পাথেয় মানুষ সংগ্রহ করে থাকে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রযত্ন বিষয়ে আস্থা বিনা সে কাজে অগ্রসর হওয়া সহজ নয়, সম্ভবও নয়। সেজন্যই আমাদের যে যোগসূত্র বাস্তব জীবনক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে ছিন্ন করার যে প্রচেষ্টা স্বদেশী সংকীর্ণতাবাদী আর তাদের দুর্লক্ষ্য বিদেশী মিত্রদের চাতুর্য ও চক্রান্তের জোরে চলছে তাকে পরাভূত না করলেই নয়। এজন্য সর্বশক্তি নিয়োগের প্রয়াসে শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন সকলকেই অগ্রসর হতে হবে। আর সাধারণ মেহনতি মানুষ যখন পূর্ণ সচেতন হয়ে ধর্ম-জাতি-ভাষা ইত্যাদি নিয়ে বিভেদের ধ্বজা তুলে যারা দেশের এবং ইতিহাসের সমূহ ক্ষতি করতে ব্যাপৃত রয়েছে তাদের প্রতিহত করার সংগ্রামে শামিল হবে তখনই লক্ষ্যসাধনে প্রকৃষ্টতম পথ আমরা অতিক্রম করতে পারব।

একটা শেষ কথা বলার সুযোগ নিতে চাই। বর্তমান ইয়োরোপে 'our common European home' বলে একটা ধুয়ো বিশেষ করে তুলেছেন সোভিয়েত নেতা গর্বাচভ। এর গুণাগুণবিচার এখন অবান্তর, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর কথা তুলতে গিয়ে মনে আসছে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে স্তালিন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত, আমার বিশেষ বন্ধু কে. পি. এস. মেননকে বলেছিলেন যে কথা (যা তিনি 'Memoirs & Musings' গ্রন্থে লিখেও গিয়েছেন)। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনকে কতকটা "আদিম" বলে বর্ণনার পর স্তালিন জানতে চেয়েছিলেন যে ভারতবিভাগের ফলে জড়িত সবাইয়েরই যখন ক্ষতি, তখন একপ্রকার 'সংযুক্তি' (confederation) নিয়ে ভারতবর্ষ ভাবছে কি? পাকিস্তান আর ভারতের ছাড়াছাড়ি যেভাবে এবং যে-উদ্যোগে আর যে নয়া সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের অঙ্গীভূত রূপে এসেছিল তাতে 'সংযুক্তি' হয়তো প্রায় অভাবনীয় মনে হতে পারে। অন্তত ১৯৫৩ সালে যখন স্তালিন একথা বলেন, তখনও সময় ছিল সঙ্গীন। তখন হতে দুনিয়ার সব নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। গান্ধী বেঁচে থাকলে হয়তো বা অমন দুঃসাহসী পরিকল্পনা অসম্ভব থাকত না। নেহরু মনে হয় পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের হুমকি অগ্রাহ্য করে এদিকে এগোবার সংকল্প ও সাহস সংগ্রহে অপারগ হয়তো হতেন। আজও হঠাৎ এ-ধরনের 'সংযুক্তি' প্রস্তাব অনেককেই চমক দেবে, রুষ্ট করবে, প্রস্তাবকদের বাতুল-নির্বোধ-উন্মাদ কিংবা আরও কটু নিন্দা শুনতে হবে। কিন্তু তাৎক্ষণিক সাফল্যের লেশমাত্র আশা না রেখে অথচ ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতের উপর ভরসা করে ভারত কি ভাবতে আরম্ভ করতে পারে না যে, আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, বার্মা (তার নতুন নাম যাই হোক), সিংহল প্রভৃতি নিয়ে একটা মৈত্রীক্ষেত্র সৃষ্টি এমন কিছু অসম্ভব কাজ নয়, অসঙ্গত তো নয়-ই? আজ ও আগামী কালের হিসাবে নয়। কিছু পরিমাণে ঐতিহাসিক দূরদৃষ্টি (এবং হ্যাঁ, কল্পনাও) নিয়ে এই সহমর্মী সহযোগী সাহচর্য-ক্ষেত্র নির্মাণে ভারতবর্ষ সক্রিয় ভূমিকায় নামতে পারে না, অবিলম্বে সার্থকতার সম্ভাবনা ব্যতিরেকেই?

শব্দের অমোঘ শর: বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলীচিন্তা

পবিত্র সরকার

১

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালে (১৮৩৮-১৮৯৪) লিও স্পিট্‌সার (১৮৮৭-১৯৬০) প্রবর্তিত নব্যশৈলী-বিজ্ঞানের জন্ম হয় নি, তার উদ্ভব হয়েছে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। প্রাচীন বা প্রথাগত শৈলীভাবনার সঙ্গে এই নব্যশৈলীবিজ্ঞানের পার্থক্য স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট-ভাবেই চোখে পড়ে। নতুন শৈলীবিজ্ঞানে লেখকের শৈলী বা স্টাইলকে দেখা হয় কতকগুলি চিহ্নের বা লক্ষণের আশ্রয় হিসেবে। এগুলি লেখকের ব্যক্তিত্বের চিহ্ন, তাঁর নিজস্বতার লক্ষণ—এগুলি অন্যদের লিখন-রীতি থেকে তাঁর লিখনরীতিকে আলাদা করে দেয়। কিন্তু পুরানো ধরনের 'রেটরিক'-প্রভাবিত শৈলী-ভাবনায় লেখকের স্টাইলকে দেখা হত: (ক) লেখার একটি অর্জনীয় ও অনুশীলনসাধ্য আদর্শ হিসেবে—লেখককে চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা ওই রচনাদর্শকে আয়ত্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে লেখকে-লেখকে আলাদা হওয়ার আদৌ দরকার নেই, বরং যত বেশি লেখক এই আদর্শ রীতিকে গ্রহণ করেন ততই ভালো, এবং (খ) নিজের কথা পাঠককে জ্ঞাপনের সর্বোত্তম সরণি বা 'চ্যানেল'[১] হিসেবে। এখানে ব্যক্তির স্বকীয়তা বা আত্মতার অভিব্যক্তিটি গুরুত্ব পায় না। কাজেই প্রথাগত শৈলীভাবনায় ভালো রচনাশৈলী একই সঙ্গে অনুকরণীয় ও উপলভ্য আদর্শ, আবার জ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ বাহন। লেখকের ব্যক্তিত্বের অভিক্ষেপ ততক্ষণই সহ্য করা হবে যতক্ষণ তা পাঠকের বোধগম্যতায় বাধা না ঘটায়। লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রাথমিক দায় হল লেখাকে স্পষ্ট ও আবেদনময় করে তোলা। এই লক্ষ্যকে অতিক্রম করে যদি ব্যক্তিত্ব স্বপ্রাধান্য অর্জন করতে চায় তা গ্রাহ্য হবে না। ইয়োরোপের ইতিহাসে আরিস্ততলের সময় (খ্রীপূ ৩৮৪-৩২২) সময় থেকেই[২] ব্যক্তিত্ব ও রচনাশৈলীর সমীকরণ মোটামুটিভাবে গৃহীত হয়েছে, যদিও তা একটি সংক্ষিপ্ত, তীব্র উচ্চারণ লাভ করে মাত্র এই অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ফরাসি

জুন বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মমাস

বিজ্ঞানী বুফোঁ-র (১৭০৭-১৭৮৮) মুখে—le style, c'est l'homme même—'শৈলী লেখক নিজেই'। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িকেরা বুফোঁর এই কথার সংবাদ রাখতেন কি না জানি না, রাখলেও কথাটিকে স্বীকার করতে তাঁদের দ্বিধা হত। গণতন্ত্রবদ্ধ, সাক্ষর ও শিল্পসমৃদ্ধ রেনেসাঁস-পরবর্তী ইয়োরোপে যে-উচ্চারণ স্বাভাবিক ও সঙ্গত শোনায়, তা একাধারে সামন্ত-প্রথাশ্রিত, অন্যদিকে ঔপনিবেশিকতায় আক্রান্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে তত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে না, বিশেষত যে বঙ্গদেশে তখন প্রায় সবে মুদ্রিত কাগজপত্র গ্রন্থাদি পড়তে আরম্ভ করেছে।

এই নব্যশৈলীবিজ্ঞানের পর্যায়ও শেষ হয় এক সময়, আরম্ভ হয় ভাষাবিজ্ঞান, বিশেষত সাংগঠনিক (স্ট্রাকচারাল) ভাষাবিজ্ঞান প্রভাবিত নতুনতর এক শৈলীবিজ্ঞান। স্পিট্‌সার ও লুকাসের মতো মানুষেরা মূলত 'উন্নত' সাহিত্যের রীতি নিয়েই ভেবেছেন। এমন-কী প্রাহা ভাষাবিজ্ঞান সমিতির মুকারোভস্কি বা ইয়াকব্‌সন প্রমুখ শৈলীতাত্ত্বিকেরা সাহিত্যের বা কাব্যের ভাষার বাইরে মৌখিক বাচনের শৈলী বিশ্লেষণ করার কথা ভাবেন নি। সম্প্রতি তারও শৈলী, কিংবা বিজ্ঞাপন, সংবাদপ্রচার ইত্যাদি অ-সাহিত্যের শৈলীর বিচার-বিবেচনা আরম্ভ হয়েছে।[৩] স্পিট্‌সার তাঁর 'ফিলোলজিক্যাল সার্কল'-এর সন্ধান করছেন রাম-শ্যাম-যদুর ভাষায়, একথা কোনোভাবেই ভেবে উঠতে পারি না আমরা। অন্যদিকে আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান ঠিক তা-ই করতে চায়, তা লিখিত বা কথিত যে-কোনো বাচন বা 'টেক্সট'-এর বিশিষ্ট লক্ষণগুলি খুঁজে বার করতে চায়, যে-লক্ষণগুলি ওই বাচনের মালিককে অন্যদের থেকে আলাদা করে আনবে। স্পিট্‌সার-কথিত 'দ ওআর্ক অব আর্ট'[৪]-এর সঙ্গে এই আধুনিক শৈলীবিজ্ঞান নিজেকে সবসময় জড়াতে চায় না। নব্যতর এই শৈলীবিজ্ঞানের চর্চায় স্পিট্‌সার উৎসাহ বোধ করতেন না, বঙ্কিমচন্দ্র তো নিঃসন্দেহে এর দিকে এক অনমুমোদনপূর্ণ তীব্র ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেও শৈলী সাহিত্যেরই শৈলী, কিন্তু এ শৈলী যতটা বিষয়ের বাহন ততটা বিষয়ীর বাহন নয়। যাঁর নিজের রচনা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে চিহ্নিত, তিনি যে তাঁর শৈলীচিন্তায় ব্যক্তিত্বের বিষয়টি এমন গৌণ করে দেখবেন তা ভাবতে একটু বিস্ময় জাগে। এমন-কী স্পিট্‌সারের কথাও তাঁর পছন্দসই হবে না, কারণ স্পিট্‌সার লেখকের শৈলীকে প্রদত্ত বা চূড়ান্ত হিসেবে দেখেন, তিনি তার ভালো-মন্দ ঔচিত্য-অনৌচিত্য সংগতি-অসংগতি সৌন্দর্য-অসৌন্দর্য ইত্যাদি নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেন না। তাঁর সন্ধান কেবল সেইসব শব্দ বা ব্যবহারের দিকে, যা বারবার ঘুরে-ঘুরে আসে, যার ওই পুনরাবর্তন লেখকের প্রবণতাকে চিহ্নিত করে দেয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে লেখকের শৈলী চূড়ান্ত নয়। 'রেটরিক' ভাবনার অনুসারীদের মতো তাঁরও বিশ্বাস, একটি আদর্শ শৈলী আছে—লেখককে তার কাছে পৌঁছোতে হবে। একালে শৈলীকে সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে ব্যাপকতর ভাবে 'ভাষা'-র সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বা স্পিট্‌সারদের অনুকূলতা তৈরি হত না।

সাহিত্য-শৈলীর বাহনধর্মই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বেশি দামি। তিনি নিজে তখনও পর্যন্ত অপ্রস্তুত ও অপরিচ্ছন্ন বাঙলা কথাসাহিত্যের গদ্যকে চমৎকার একটি ব্যক্তিগত প্রকাশনা হিসেবে তৈরি করেছিলেন, তা একই সঙ্গে ছিল বিচিত্র ও সৌন্দর্যময়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) রচনাতেই অবশ্য কথন-শৈলীর মধ্যে শক্তি, সামঞ্জস্য ও ছন্দোস্পন্দ যুক্ত হয়েছিল, 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এ প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) কলকাতার জীবনচিত্র ছাড়া অন্যত্র বর্ণনা অংশে বিদ্যাসাগরের রচনারীতির দ্বারা যে প্রভাবিত হয়েছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) প্রদর্শিত তৎসম শব্দের সমাসবহুল ও আভিধানিকতা ও অনু-প্রাসক্লিষ্ট ভ্রান্ত ও কৃত্রিম গদ্যরীতি থেকে যাত্রা শুরু

করেছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথনশৈলীর কাছে তিনি নিশ্চয়ই সৌষম্যের আদর্শটি খুঁজে পান। প্রকাশ্যে তার যত বিরোধিতাই করুন না কেন। "আলালের ঘরের দুলাল-ও তাঁকে নেতির দিক থেকে সাহায্য দেয়, অর্থাৎ অতিশয় লৌকিক গদ্যের বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। ব্যক্তিত্বের বহু-বর্ণাঢ্য প্রকাশ হিসেবে নিজের গদ্যকে গড়ে তুললেও বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাবনায় গদ্যের বাহনধর্মই যে বেশি মূল্য পেয়েছিল তা আমরা লক্ষ করব। বলা বাহুল্য, প্রাহার ভাষাবিজ্ঞান সমিতি ভাষার যে তিনটি কাজ ('ফাংশন') নির্দেশ করেছিলেন—জ্ঞাপন ('কমিউনিকেশন'), প্রকাশ ('এক্সপ্রেশন') এবং প্রবর্তনা ('পার্সুয়েশন')—সেইরকম যান্ত্রিক বিভাগ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বাহনসূচক শৈলীচিন্তাকে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না। তাঁর কাছে যে-শৈলী সর্বোত্তম রূপে গণ্য, সার্থক বাহন হয়ে ওঠার জন্যই তাকে প্রকাশ এবং প্রবর্তনার গুণগুলিও আয়ত্ত করতে হবে। তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন 'a literature for the *people* of Bengal.'[৫] এই *people* কারা, সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সুনির্দীত ছিল। তাঁরা হলেন কারিগর ও দোকানিরা, গ্রামের জমিদার ও মফঃশলের উকিল সম্প্রদায়, অফিসের অধস্তন কর্মচারীর দল, আর যে-অসংখ্য মানুষ মাতৃভাষায় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে চলেছেন তাঁরা। যখন কোনও পাঠক-গোষ্ঠীর, এবং ব্যাপক পাঠকগোষ্ঠীর জন্য লেখক লিখতে বসেন, তখন তাঁর লেখায় এবং শৈলীভাবনায় সেই পাঠকগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে যাওয়ার প্রসঙ্গটিই বড়ো হয়ে ওঠে। ফলে তাঁর শৈলী হয়ে ওঠে বাহন।

২

এ প্রবন্ধে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলীচিন্তার পরিচয় গড়ে তুলতে গিয়ে প্রথমে প্রান্তসীমার দিক থেকে অগ্রসর হব, তারপর ক্রমশ তাঁর কেন্দ্রীয় উক্তিগুলিকে ধরবার চেষ্টা করব। 'প্রান্তসীমা' বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সেইসব রচনা, যেগুলিতে শৈলী বঙ্কিম-চন্দ্রের মূল আলোচ্য নয়। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কখনও পার্শ্বিকভাবে, কখনও রূপকের সৃষ্টিতে, কিছু মন্তব্য করেছেন যেগুলি তাঁর শৈলী-ধারণাকে পুষ্ট করে। যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শৈলীচিন্তা বিষয়ে প্রণালীবদ্ধ কোনও সামগ্রিক নিবন্ধ রচনা করে যান নি, বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে এ বিষয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, মন্তব্য ইত্যাদি লিখেছেন, সেহেতু আমাদের কাছে তাঁর পার্শ্বিক মন্তব্য এবং তাঁর প্রাসঙ্গিক আলোচনা দুই-ই মূল্যবান। তা একে অন্যের পরিপূরক। এ দুয়ের যথোচিত উপস্থাপনা ও সমন্বয়েই হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলীচিন্তার একটি সুসংবদ্ধ মানচিত্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে। বঙ্কিমচন্দ্র কদাচিৎ অবান্তর কথা বলেছেন, কদাচিৎ বিষয়ের বাইরে গিয়ে অনভিপ্রেত বিস্তার ঘটিয়েছেন, বক্তব্যের কদাচিৎ স্ববিরোধের শিকার হয়েছেন। ফলে তাঁর শৈলীচিন্তার একটি কাঠামো গড়ে তোলা খুব কঠিন হবে না।

তাঁর প্রান্তীয় উক্তিগুলির মধ্য থেকে প্রথমে আমরা "কমলাকান্ত"[৬] থেকে এই কথাগুলিকে লক্ষ করি :

> কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম-স্বরে কু বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত-নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে—বে-পরদা কড়ি মাধ্যমের কাজ নয়।[৭]

বলা বাহুল্য, কমলাকান্তের কথা একটি রূপকে আশ্রিত। কিন্তু এই রূপক যে সাধারণভাবে সাহিত্যের বিষয় ও প্রকাশ-ভনিতার সঙ্গে যুক্ত, তা বঙ্কিমচন্দ্র একটু পরেই স্পষ্ট করেন, লেখক বা কবি হিসেবে একদিকে স্যার জেম্‌স ম্যাকিন্টশ ও টমাস ব্যারিংটন মেকলে-র, অন্যদিকে ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দের

তুলনা করে। অর্থাৎ পাঠককে মুগ্ধ করতে হলে চাই আকর্ষক বিষয় বা ভঙ্গি। 'লোকরহস্য'-র[৮] "বসন্ত এবং বিরহ" রচনাতে আবার লক্ষ করি বঙ্কিমচন্দ্র তিন বিরহিণীর সংলাপ রচনা করেছেন, আসন্ন মধুমাস তাদের কাছে কী দুর্বহ যন্ত্রণা নিয়ে আসছে এই নিয়ে কথাবার্তা বলছে তারা। তাদের দুজন (রামী ও শ্যামী) এ নিয়ে উচ্ছ্বাসময় অত্যুক্তির প্রতিযোগিতায় নামে, শ্যামীর বিবৃতি খানিকটা প্যারোডির পথ নেয়। ওইসব উচ্ছ্বসিত পল্লবিত বর্ণনার শেষে রামী বলে, 'আমার বসন্তবর্ণনা শেষ হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, মলয় মারুত এবং বিরহ, এই চারিটির কথাই বলিয়াছি, আর বাকি কি?' তার উত্তরে বামী, যে এদের মধ্যে একটু বাস্তবঘেঁষা গদ্যময় চরিত্রের, তাদের জানাচ্ছে, 'দড়ি আর কলসী।'[৯]

এখান থেকেও আমরা অনুমান করতে পারি, বর্ণনায় মামুলি ও প্রসিদ্ধ উপকরণ ব্যবহারে বঙ্কিমচন্দ্রের অনীহা, সাহিত্যিক 'চেস্টনাট্' বা 'বাঁধাগৎ' সম্বন্ধে তাঁর অনাসক্তি। অবান্তর উচ্ছ্বাস নয়, অতিরঞ্জন নয়, বহুচর্চিত ও পুনঃপুনরাবৃত্ত উপকরণের ব্যবহার নয়। তার বদলে কী—সে প্রশ্নের উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র বারবার নানা প্রসঙ্গে দেবেন—সে কথায় আমরা পরে আসছি। বলা বাহুল্য, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রভাবিত, কিন্তু কার্যত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দ্বারা তিরস্কৃত সেই সমাস - অনুপ্রাসবহুল গদ্যরীতিকে সম্পূর্ণত বর্জন করেছেন, যে গদ্যের নমুনা ছিল এইরকম :

> স্বনাথ শশধর বিরহিণী বিঘোর তমসাম্বরাবৃতা গভীরা নিশীথিনী সকাশ নিবিড় জলধরমাল গগনমণ্ডলে নিয়ত নিরীক্ষণ করিতেছি। মন্দমোন্মথিত জনরাজী হৃদয় বিদারক ঘোরঘন নির্ঘোষ নিনাদ শ্রবণে চমকিতচিত্ত চাপল্য প্রাপ্ত হইতেছে। নিবিড় নিলাঙ্গিনি যমুনা-পুলিনে শ্রীরাধা চাতকী নীরদ কদম্ববিহারি শ্যাম শরীর উপরি তরলিত বিকচ বিমল বনমালা তুলিয়া নবজল-ধরোপরি শম্পা কম্পায়মানা হইতেছে, কর্ণকুহরবিদারক ভীষণাশনিনিনাদে ভুবন চমকিত হইতেছে, কাদম্বিনী বর্ষিত বারি বিন্দু বিশালবেগে ধরাতলে পতিত হইতেছে।[১০]

কৈশোরের এই উগ্র আত্মপ্রক্ষেপী গদ্য থেকে পরে বহু দূরে সরে এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত "কবিতাপুস্তক"-এর ভূমিকায় নিজের বাল্যরচিত দুটি কবিতা সম্বন্ধে তাঁকে বলতে দেখি যে সেগুলি 'নীরস, দুরূহ এবং বালকসুলভ অসার কথায় পরিপূর্ণ।'[১১] এমন-কী এ কবিতা পড়ে তাঁর কলেজের এক অধ্যাপক যে এগুলিকে "হিয়ালি" বা হেঁয়ালি হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, তাও তিনি জানাতে ভোলেন না। কৈশোরে নিজে যা রচনা করেন পরিণত যৌবনে তারই অঙ্কুশে সমালোচনা করেন তিনি। তাঁর সেই পরিবর্তিত পরিণত শৈলীচিন্তার ছবিটির দিকেই এবার আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

৩

পরে উত্তম রচনাশৈলী বলতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কেন্দ্রীয়' আলোচনাগুলিতে যে-ধারণা গড়ে দিতে চেয়েছেন তার তিনটি স্পষ্ট কিন্তু পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দিক আছে—১. ভাষাগত; ২. সামাজিক-উপযোগবাদী এবং ৩. নৈতিক। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাছে বরণীয়তম শৈলীর কিছু ভাষাগত, মূলত শাব্দিক বা lexical লক্ষণ নির্দেশ করেছেন, বলে দিয়েছেন উত্তম শৈলী নির্মাণ করতে হলে লেখককে কোন্-কোন্ শব্দ গ্রহণ করতে হবে এবং কোন্-কোন্ শ্রেণীর শব্দকে পরিহার করতে হবে; তার পরে তাঁর বিবেচনা উত্তম শৈলী কাদের জন্য, কারা তার পাঠক বা গ্রাহক হবে, কাদের লক্ষ করে তা রচিত হবে; তাঁর তৃতীয় অনুসন্ধান এই শৈলী কেন বা কী উদ্দেশ্যে রচিত হবে, কোন্ কার্য তা সিদ্ধ করবে, সেই বিষয়ে।

উত্তম শৈলীর ভাষাগত বা শব্দগত চারিত্র কী দাঁড়াবে সে সম্বন্ধে তাঁর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ফতোয়া আছে ১৮৭৮ সালে রচিত "বাঙ্গালা ভাষা"[১২] প্রবন্ধে। "ক্যালকাটা রিভিউ"-তে প্রকাশিত প্রেসিডেন্সি

কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির "Bengali Spoken and Written"[১৩] নামক বিখ্যাত প্রবন্ধের ঠিক পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল, খানিকটা শ্যামাচরণের প্রবন্ধের প্রতিক্রিয়ও সম্প্রসারণ হিসেবে। শ্যামাচরণ অবশ্য বাঙালির মুখের ভাষার সঙ্গে তার সাহিত্যের ভাষার (সাধু ভাষার) দূরত্ব দেখে বিমর্ষ ছিলেন এবং চলিত ভাষাকে সাহিত্যের এবং পাঠ্যপুস্তকের ভাষা করে তোলার দাবি জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অতটা অগ্রসর হতে চান নি। তিনি সাধু ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু কোন্ সাধুভাষা? ১৮৫৮-র পর বাঙলা সাহিত্যে সাধুভাষার দুটি বিদ্যমান ও পরস্পর-দূরবর্তী রীতির উদ্ভব ঘটেছে—একটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর অনুগামীদের সংস্কৃতগন্ধী গদ্য, আর আরেকটি প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কথ্যতা-সন্নিহিত, আটপৌরে, কিছুটা অমার্জিত অথচ সাধু গদ্য।[১৪] অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সংস্কৃতপন্থীদের গদ্য যে দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবিকতাকে পরিবেশনের যোগ্য নয়, যেমন তা নয় সাধারণ সাক্ষর নারী ও বালকবালিকাদের কাছে সুবোধ্য—তা প্যারীচাঁদ মিত্র লক্ষ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর গদ্য সমসাময়িকদের কাছে অবিমিশ্র প্রশংসা পায় নি। মধুসূদন সে ভাষাকে 'a language of fishermen' বলে ভর্ৎসনা করেছিলেন,[১৫] তা ওই মহাকাব্যের জলদমন্দ্রে মুগ্ধ কবির পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। আমরা লক্ষ করি, বঙ্কিমচন্দ্র নানা জায়গায় সুযোগ পেলেই সংস্কৃতানুসারী বাঙলা গদ্যের উপর তাঁর বিরূপতা প্রকাশ করেন। "বাঙ্গালা ভাষ." প্রবন্ধের সর্বত্রই তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপমেশানো তিরস্কার নিক্ষিপ্ত হয় সংস্কৃতানুসারী সাধুভাষার বিরুদ্ধে, যেমন 'হে ভ্রাতঃ' বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় সে যেন যাত্রা করিতেছে, 'ভাই রে' বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে।[১৬] "Bengali Literature"[১৭] নামক আলোচনায় প্রথমে তির্যক ইঙ্গিত করেন এই বলে—'By far the greater number of Bengali writers belong to the Sanskrit school; but by far the greater number of *good* writers belong to the other'. (বক্রাক্ষর আমাদের)। এই সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদের লেখা বাঙলা গদ্য সম্বন্ধে পরে বঙ্কিম-চন্দ্রের মন্তব্য—...'a dull pompous array of high-sounding Sanskrit words continue to grate on the ear in perpetual recurrence.'[১৮] এঁদের শব্দগত সাম্প্রদায়িকতা বা দ্বৈপায়নী মনোভাব সম্বন্ধেও তিনি খোঁচা দিতে ছাড়েন না—'Anything which bears the mark of foreign origin, however expressive or necessary, it may be, is jealously excluded.'[১৯] ফলে "বাঙ্গালা ভাষা" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র "আলালের ঘরের দুলাল"-এর ভাষার সংবর্ধনা জানিয়ে লিখলেন—'যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।'[২০]

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী একটি বাঙলা শৈলীর সন্ধান করেছেন। একদিকে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির প্রায় কালাপাহাড়ি নির্দেশ (বঙ্কিমচন্দ্রের মতে)—বহুবচনে 'গণ' প্রত্যয়টি বর্জন করতে হবে, 'পৃথিবী' ইত্যাদি শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ গণ্য করা চলবে না, 'জনৈক' লেখা চলবে না বাঙলায়, 'ভ্রাতা', 'কন্যা', 'কর্ণ', 'স্বর্ণ', 'তাম্র', 'পত্র', 'মস্তক', 'অশ্ব' ইত্যাদি কথার বদলে 'ভাই' 'কাল' 'সোনা' 'তামা' ইত্যাদি কথাই কেবল ব্যবহার করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণায় এসব কথা বলে শ্যামাচরণ 'বাঙ্গালাভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন।'[২১]

শ্যামাচরণের নানা যুক্তির সারবত্তা মেনেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে এতটা এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নন। তাঁর নিজের বিবেচনা কিন্তু খুব প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট—

> যদিও আমরা এমন বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার উচিত নহে। কেননা ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন ধরিব ?[২২]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভাষাগত প্রাদেশিকতা হয়তো এখন আমরা মানব না। তিনি যেগুলিকে সংস্কৃত শব্দ বলেন সেগুলিকে আমরা বাঙলা শব্দই বলব, ধার-করা হলেও সেগুলি বাঙলা শব্দই। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের কথার মধ্যে এই প্রথম বাঙলায় লেখার ভাষার মধ্যেও বিভিন্ন শৈলীগত স্তরবিন্যাসের সম্ভাবনা, বা রেজিস্টারের সম্ভাবনা ও স্বীকৃতি জেগে উঠছে তা দেখতে পাই। এর আগে যাঁরা লেখার ভাষা নিয়ে কথা বলেছেন তাঁদের কাছে লিখিত ভাষার একটিমাত্র ভঙ্গি বা রেজিস্টার স্বীকৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধেই উদ্ধার করেছেন রামগতি ন্যায়রত্নের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৭৩) বইয়ের ক্ষোভ—'এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ববিধ গ্রন্থরচনায় এইরূপ (অর্থাৎ, "আলালের ঘরের দুলাল"-এর মতো—প.স.) ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না ?—আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না।…ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জা বোধ হয়।'[২৩] ফলে ন্যায়রত্ন 'আলাল'-কে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচনে নিষেধ করেন, কারণ তার ভাষা 'সর্ববিধ পাঠকের উপযুক্ত নহে।'[২৪]

এ থেকেই স্পষ্ট যে রামগতি ন্যায়রত্ন একদিক থেকে সাধু গদ্যের একটিমাত্র ভঙ্গি বা রেজিস্টার অনুমোদন করেন, অন্যদিকে শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির (চলিত) রীতির ধারণাও ব্যাপক বা বিচিত্র নয়। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যস্থলে, "নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া" বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেন তা সেই মুহূর্তে লেখ্য গদ্যেরও বিচিত্র সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দেয়—

> …বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে ? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।[২৫]

একই লেখ্য ভাষার মধ্যে এই যে নানা স্তর, নানা ভঙ্গি ও নানা তরঙ্গের সম্ভাবনা স্বীকার করে নিচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তার নিয়ন্তা হল বিষয় বা লেখকের বক্তব্য। বিষয়ের যেমন বৈচিত্র্য থাকবে, তেমনই রচনাভঙ্গির বা রেজিস্টারের বৈচিত্র্য থাকবে। একটি-মাত্র রচনাভঙ্গির কঠোর নিগড়ে লেখকের হাত বেঁধে দেবার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রহিষ্ণুতা এক জায়গায় এসে বাধা পায়, তা ওই হুতোমের ভাষা। 'হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে।'[২৬] এখানে বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমি ভাষা গ্রহণ না করার পক্ষে ভাষাগত কারণ দু-একটি উল্লেখ করেছেন—নিস্তেজ, বাঁধনহীন, অসুন্দর ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর আসল আপত্তি হুতোমের রুচির বিরুদ্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র আর সমস্ত ধরনের শব্দ সহ্য করবেন, কিন্তু অশ্লীল ও 'অপবিত্র' শব্দ তাঁর কাছে পরিত্যাজ্য।

৪

এইখানেই বঙ্কিমের শৈলীচিন্তার দ্বিতীয় মাত্রা, অর্থাৎ সামাজিক-উপযোগবাদী মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি আমরা। আর সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ করি যে, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সামাজিক-উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপরেই তাঁর শৈলীচিন্তার নৈতিক মাত্রার নির্ভর। কাজেই দুটিকেই পৃথকভাবে আলোচনা না করে একত্রই বিচার করা সম্ভব।

অর্থাৎ 'সাহিত্য কেন' বা 'কাদের জন্য' এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শৈলী-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিরও উত্তর খোঁজেন। বঙ্কিমচন্দ্র-কল্পিত এক 'গুরু' অন্যত্র আমাদের জানাচ্ছেন, "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কী করিব ?" "লইয়া কী করিতে হয় ?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।"[২৫] তাঁর সাহিত্য-জিজ্ঞাসাও এই বড়ো প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িত। সুতরাং "বাঙ্গালা ভাষা" পর্বে তাঁর বদ্ধমূল সিদ্ধান্ত, 'কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য **শিক্ষাদান, চিত্তসঞ্চালন**।'[২৮] (স্থূলাক্ষর আমাদের)। সাহিত্যে নয় কেবল 'প্রকাশ', সাহিত্য,—অন্তত গদ্যে রচিত সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পাঠকমুখী, পাঠক-সাপেক্ষ। লেখকের অভিব্যক্তিতে সাহিত্যের পর্যবসান বা সার্থকতা খোঁজেন নি বঙ্কিমচন্দ্র। সে সার্থকতা খুঁজেছেন সঞ্চারে, বিস্তারে। এ প্রবন্ধে একটু আগেই বঙ্কিমচন্দ্রেরই 'ধর্মতত্ত্ব' আর কমলাকান্তের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই আমরা—'যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই।'[২৯] এবং এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র লেখার ভাষা হিসেবে হুতোমি ভাষার দাবি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। "টেকচাঁদি ভাষা" হাস্য ও করুণরসের জন্য তাঁর অনুমোদন পায়, কিন্তু "গম্ভীর বা উন্নত চিন্তাময়" বিষয়ের জন্য পায় না।

সাহিত্য সম্বন্ধে এই যে সামাজিক-উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, তা থেকেই শৈলীর দুটি বিশেষ গুণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হল 'সরলতা এবং স্পষ্টতা।'[৩০] কারণ তার আগেই তিনি বলে নিয়েছেন, 'সাহিত্য কী জন্য, গ্রন্থ কী জন্য ? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি-ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধহয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি একথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোনো ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোনো লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারিজন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার

প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাষণ্ড বলিব।'[৩১]

'পরোপকারকাতর' কথাটি লক্ষ করবার মতো। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্যসৃষ্টিও পরোপকারের একটি সরণি মাত্র, আর সেই কারণেই সাহিত্যের ভাষা হবে সরল ও স্পষ্ট। এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র বারবার নানা সূত্রে বলেন, একথার পুনরাবৃত্তিতে তাঁর ক্লান্তি নেই। মুখ্যত সংস্কৃতপন্থী লেখকদের সমালোচনায় তাঁর এ-কথা প্রতিভাত হলেও, ইংরেজিনবিশদের সম্বন্ধেও তিনি আমাদের সতর্ক করেন,—তাদেরও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয় আছে। 'মুখার্জি'স ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদক শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়কে ১৮৭২ সালের এক চিঠিতে লেখেন—…'the English for good or evil has become our vernacular ; and this tends daily to widen the gulf between the higher and the lower ranks of Bengali society. This, I think, is not exactly what it ought to be ; I think that we ought *to disanglicise* ourselves, so to speak, to a certain extent, and to speak to the masses in the language which they understand."[৩২] তবু বাঙলা সাহিত্যের ভাষার জটিলতা, অতি-অলংকরণ ও অস্পষ্টতা নিয়েই তিনি অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন তা লক্ষ করি। বন্ধু জগদীশনাথ রায়ের ছেলে খগেন্দ্রনাথ রায়ের রচনা সম্বন্ধে জগদীশনাথকে লেখা (৩০ ডিসেম্বর, ১৮৭৪) একটি চিঠিতে তাঁর খগেন্দ্র (বা "খনি"-র) প্রতি নির্দেশ—'Khani must, in my opinion, chasten down his style and curb his redundant flow of words and imagery, which at present obscures the meaning and wearies the reader. He should try to avoid too much rhetoric and ornaments. Explain to him that clearness and simplicity are the best of all ornaments, and that I have arrived at the conviction after much painful experience.'[৩৩] প্রায় দশ বছর পরে "প্রচার" ১২৯১-এর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত "বাঙ্গালার নব্য লেখকদের প্রতি নিবেদন"-এ তাঁকে প্রায় এ কথারই পুনরুক্তি করতে শুনি—'সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। কেননা, লেখার উদ্দেশ্য পাঠককে বুঝান।'[৩৪]

এখানেই শেষ নয়। পাঠ্যপুস্তক "সহজ রচনাশিক্ষা"র (১৮৯২ ?) "Advertisement" নামক ভূমিকায় তিনি 'the existing practice of the best writers" বলতে তাঁদের রচনার তিনটি গুণ লক্ষ করেছেন—(1) Correctness, (2) Precision, and (৩) Perspicuity.[৩৫] বইয়ের মধ্যে নির্দেশ করেছেন শিক্ষণীয় চারটি গুণ—'(১) বিশুদ্ধি, (২) অর্থব্যক্তি, (৩) প্রাঞ্জলতা এবং (৪) অলঙ্কার।'[৩৬] এ বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিন্যস্ত উচ্চারণগুলিকে আমরা পরপর সাজিয়ে দিই—

> যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভালো নয়, কি বিদেশী কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিয়ো না।[৩৭]

আমরা পরক্ষণেই দেখি, "বিজ্ঞাপন" কথাটিতে দ্ব্যর্থকতা ও অস্পষ্টতা আছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র এই দ্বিতীয় পাঠেই, ওই একই পৃষ্ঠায় "ইশ্‌তিহার" শব্দ ব্যবহারের উপদেশ দিয়েছেন, কারণ তাতে 'অর্থের কোনো গোল নাই।'

> অনর্থক কতকগুলা সংস্কৃত শব্দ লইয়া সন্ধি সমাসের আড়ম্বর করিয়ো না—অনেকে বুঝিতে পারে না। যদি বলি "মীনক্ষোভাকুল কুবলয়"—তোমরা কি কেহ সহজে বুঝিবে ? আর যদি বলি "মাছের তাড়নে পদ্ম কাঁপিতেছে", তবে কে না বুঝিবে ?[৩৮]
>
> অনর্থক কথা বাড়াইয়ো না।[৩৯]
>
> জটিল বাক্য রচনা করিয়ো না।[৪০]

কত ভাবেই না বঙ্কিমচন্দ্র এই সরলতা ও স্পষ্টতার কথা বলেছেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ" (১২৯২/১৮৮৫)-এর ভূমিকায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তার" নিন্দা করেন তিনি, 'শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়।'[৪১] কিন্তু একটু পরেই লক্ষ করি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতার "খাঁটি বাঙ্গালা"র প্রশংসা। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেন, "একদিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরা গাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়্‌বিবাক্ মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিকে ইংরেজির ভরা গাঙ্গে বেনো জল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবোলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেশ, বজরা, খুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত ; মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোত বড় ক্ষীণ বহিতেছে।'[৪২] অবশ্য এ কথা থেকে আমাদের যদি একটু সংশয় জন্মে যে, সংস্কৃত ও ইংরেজির ছোঁয়াচ সম্পূর্ণ বাঁচিয়ে এক কাল্পনিক "খাঁটি বাঙ্গালা" গড়ে তোলাই বঙ্কিমের অভিপ্রেত ছিল কি না, "বাঙ্গালা ভাষা" ও "সহজ রচনাশিক্ষা" থেকে সে সংশয় নিরস্ত হয়। দেখি যে, না, শব্দব্যবহারে কোনো রকম দ্বৈপায়নবৃত্তি বা সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ক্লিষ্ট হয় নি। শব্দাড়ম্বর ও অবান্তর শব্দনিক্ষেপেই তাঁর মূল আপত্তি। অন্যত্রও দেখি, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের শিশুপাঠ্য কবিতাপুস্তক "গোচারণের মাঠ" (১৮৮০ ?) পড়ে প্রীত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে কঠিন সংস্কৃত শব্দাবলি পরিহার এবং যুক্তব্যঞ্জনহীন শব্দাবলির ব্যবহারের জন্য প্রশংসা করছেন।[৪৩] একই সংস্কারের পুনরাবৃত্তি পাই প্যারীচাঁদ মিত্রের কবিগান সংগ্রহ "লুপ্তরত্নোদ্ধার"-এর ভূমিকায়—'একজনের কথা অপরকে বুঝানো ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোনো কোনো লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভালো। সংস্কৃতে কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরেজিতে এমর্সনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এতদূর পৃথক যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোনো রস পায় না। … যে দেশের সাহিত্যে সাধারণের বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। …গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোনো প্রয়োজন নাই।'[৪৪]

সামাজিক-উপযোগবাদের দিক থেকে সাহিত্যের স্বীকৃতির বিষয়ে, এবং তার নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী গদ্যভাষার নির্মাণ প্রসঙ্গে সম্ভবত এই হল বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে স্পষ্ট বিবৃতি। আমরা একটু আগেই জেনেছি যে তাঁর কাছে ততদিনে ধর্মের (অর্থাৎ তিনি ধর্ম বলতে যা বোঝেন তার) তুলনায় সাহিত্য গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে তিনি আমাদের জানান, কবিতার 'দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্যে প্রেমিক হয়। এইজন্য কবি, ধর্মের একজন প্রধান সহায়ক।'[৪৫]

৫.

রচনাশৈলীর নৈতিক মাত্রা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র খুব বিস্তারিত আকারে কিছু বলেন নি। কিন্তু তাঁর কিছু নেতিবাচক নির্দেশ বা নিষেধ থেকে আমরা তাঁর শৈলীচিন্তার অন্তরালবর্তী একটি নৈতিক

বিবেচনা অনুমান করে নিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রচনাই ১৮৭৫-এর পরের দিকে ক্রমশ একটি চরিত্রনীতি ও সমাজনীতির আদর্শ মনে রেখে রচিত হয়েছে, ফলে সাহিত্যের ভাষাশৈলী সম্পর্কেও যে তিনি নীতির দিক থেকে কিছুটা ভাববেন তা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর "বাঙ্গালা ভাষা" প্রবন্ধে উচ্চারিত কথাগুলি থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি, অশ্লীল শব্দাবলিকে তাঁর অনুমোদিত শৈলীর বাইরে রাখতে চান তিনি—'ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।' হুতোমের ভাষা 'অশ্লীল' এবং 'পবিত্রতাশূন্য'—তাই তা অসুন্দর। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রুচির প্রশংসা' করতে অনিচ্ছুক। তবে দুটি ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর রুচি সম্পর্কে এই কঠোর মনোভাব শিথিল করতে দেখি, সেটি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের জন্য। একজন তাঁর সাহিত্যগুরু, অন্যজন তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ। আলোচনার উপলক্ষও তাঁদের রচনাবলির মুখবন্ধ নির্মাণ, ফলে সমালোচনার কঠোর নিরপেক্ষতা এবং প্রয়াত গুরু ও সুহৃদের প্রতি আনুগত্য ও উপলক্ষ-সম্মত সৌজন্যের টানাপোড়েনে তাঁকে ওই দুজনেরই 'অশ্লীলতা'র সামাজিক বা সাহিত্যিক কৈফিয়ত তৈরি করতে দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতার অজুহাত খুঁজেছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেতিহাসে—যেহেতু সমাজের কাছে তিনি দুর্ব্যবহার পেয়েছিলেন, সেহেতু তিনি সমাজের উপর প্রতিশোধ নিয়েছেন, তাঁর ক্রোধ 'কদর্যের উপর কদর্য ভাষাতে'[৪৬] অভিব্যক্ত হয়েছে। আর দ্বিতীয় আর-একটি কারণে অশ্লীলতা এসেছে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় 'সেকেলে ধরনের' রঙ্গরসিকতার জন্য। 'ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙালি। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল।'[৪৭] বাঙলায় নবজাগৃতির ফলে আগত ভিক্টোরীয় অতি-মার্জিত রুচিবোধ যেগুলিকে অশ্লীল হিসেবে চিহ্নিত করে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহ্যের খাতিরে সেগুলিকে সে দায় থেকে 'বেকসুর খালাস দিতে রাজি' আছেন। কিন্তু তবু 'অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জনা নাই।'[৪৮] এই 'অমার্জনীয়' অপরাধেই বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের সংকলনে সম্পাদনা যা করেছেন তা তাঁর নিজের ভাষাতে শোনা যাক—'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলি কেবল অশ্লীলতাদোষে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি।'[৪৯]

দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে এই সম্পাদনার সুযোগ তাঁর ছিল না, নাটকে সে সম্ভাবনাও কম। দীনবন্ধুকে তিনি সমর্থন করেছেন দীনবন্ধুর সর্বব্যাপী ও দুর্ধর্ষ সহানুভূতির উল্লেখ করে। দীনবন্ধু ছিলেন 'সহানুভূতির অধীন', কিন্তু তাঁর সহানুভূতি তাঁর 'অধীন বা আয়ত্ত' ছিল না। 'যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদয় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত। কিছু বাদসাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না ··। 'সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, "আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে, মায় ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মতো থাকে না। আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মতো থাকে না, নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মতো থাকে না? সবটুকু দিতে হবে।' দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন,—যে 'না তা হবে না।' 'তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।'[৫০]

অর্থাৎ কবিতার ক্ষেত্রে কাটা-ছেঁড়া যতটা সহজ হয়েছে রুচির অনুরোধে, নাটকের ক্ষেত্রে রিয়্যা-লিজমের দুর্দমনীয় দাবি ও নাট্যকারের প্রবল সহানুভূতির যুক্তি তাঁকে দীনবন্ধুর 'অশ্লীলতাকে সমর্থন করতে বাধ্য করেছে।

৬.

সেই মুহূর্তে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনায়, লক্ষ্যহীন অভিব্যক্তি যেমন বঙ্কিমচন্দ্র বাঞ্ছিত মনে করেন নি, তেমনই নিছক "লোক-রঞ্জনের" জন্য সাহিত্য-রচনাও তাঁর কাম্য মনে হয় নি। এটা যে একটা সাময়িক, অস্থায়ী ব্যবস্থা তার ইঙ্গিত আছে বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়, তিনি ব্যবহার করেন 'এখন' শব্দটি, বলেন 'এখন আমাদিগের দেশের সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষা বিবেচনা করিয়া লোক-রঞ্জন করিতে গেলে রচনা বিকৃত ও অনিষ্টকর হইয়া উঠে।'[৫১] এ কারণেই "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে" তাঁর পুনঃপৌনিক নিষেধ জেগে ওঠে, 'যশের জন্য লিখিবেন না'···'টাকার জন্য লিখিবেন না।' বলেন 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।'[৫২]

তবে কি বঙ্কিমচন্দ্র এমন ইঙ্গিত করছেন সৌন্দর্য-সৃষ্টি মঙ্গলসাধনের বিকল্প? দুটিই পরস্পর-স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষরূপে সাধনযোগ্য? তা নয়। পরক্ষণেই তিনি বলেন, 'সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।' এই পাপ-পুণ্যের ধর্ম-অধর্মের কথা এসেছে ধর্মতত্ত্বেও, যেখানে তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল ভর্ৎসনা বেজে ওঠে—'যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে তাহারা তস্করাদির ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু।'[৫৩]

তাহলে শৈলীতে বা রচনার শরীরে সৌন্দর্যের স্থান কোথায়? "বাঙ্গালা ভাষা"তে ফিরে গিয়ে লক্ষ করি, বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, রচনার প্রথম গুণ আর প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা—'তাহার পর সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।'[৫৪] অবশ্য অনেক রচনায় সৌন্দর্যই মুখ্য উদ্দেশ্য তাও তিনি পরের বাক্যেই উল্লেখ করেন। কিন্তু আমাদের তিনি মুহুর্মুহু বুঝতে দেন যে, দেশের ওই অবস্থায়, সাধারণ পাঠকের রুচি ও শিক্ষার ওই পট-ভূমিকায়, নিছক চিত্তরঞ্জন বা সৌন্দর্যসৃষ্টিনির্ভর রচনা তাঁর মনঃপূত নয়। কেবল "প্রচার" পত্রিকার ধর্মবাদী নীতিবাদী আবহে যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ করো'[৫৫] তা নয়, তার তেরো বছর আগে "বঙ্গদর্শন"-এর প্রথম সংখ্যায় "উত্তরচরিত" প্রবন্ধের শেষেও তাঁকে বলতে শুনি—'কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতি-জ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য।' এখানে অবশ্য কাব্যের 'মুখ্য উদ্দেশ্য' হিসেবেই তিনি গ্রহণ করেন সৌন্দর্যসৃষ্টিকে, নীতিপ্রচারকে বলেন 'গৌণ উদ্দেশ্য'। কিন্তু শেলীর মতের প্রতিধ্বনি করে যখন তিনি বলেন 'কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্তা'[৫৬]—তখন নীতিবিযুক্ত সৌন্দর্য যে তাঁর অভিপ্রেত নয় সে কথাও গোপন থাকে না।

ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের মানসভূমি, তাঁর সমাজ ও সময়—সমস্তই একযোগে নির্মাণ করেছে তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্যশৈলীর বিশিষ্ট ভাবনাকে। লেখকের ভাষাকে তাঁর ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হন নি তিনি, তখনকার সমাজও অন্তত গদ্য-রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিচিত্র স্ফূর্তি ও সম্ভাবনাকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তার জন্য যে-গণতান্ত্রিক পরিবেশ দরকার, সেই ঔপনিবেশিক অধীনতা ও সামন্তবাদী সংস্কারের যুগে তা সুদূরপরাহত ছিল। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমি শিক্ষার আলোকে প্রথম অভিঘাতে ব্যক্তিচেতনার আবির্ভাব যেমন লক্ষ করি আমরা,

মধুসূদনের অতিরিক্ত আত্মসচেতন উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যার চরম এবং ব্যতিক্রমী প্রকাশ, তার চেয়ে অনেক ব্যাপকভাবে জেগেছিল গোষ্ঠীচেতনা—যা অভিব্যক্ত হয়েছে উনবিংশ শতকের নানা সংস্কার আন্দোলনে, অভিপ্রায়-বদ্ধ সাংবাদিকতায়, বিষয়মুখ্য রচনায়। এই গোষ্ঠীচেতনা ও একটি বিশেষ সময় ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধই বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলীচিন্তাকে, তাঁর অন্যান্য চিন্তার মতোই, প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যথার্থই লক্ষ করেছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য 'মধ্যপথ অবলম্বন'[৫৭] করেছে। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর প্রায় তিন দশক পরে বাঙলা গদ্যের ও মধ্যপথের মধ্যেও 'ব্যক্তিগত' কারণে 'সামান্য প্রভেদ', অর্থাৎ গদ্যে ব্যক্তির মুদ্রণ লক্ষ করেছেন।[৫৮] সে দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোযোগ পড়ে নি, তার কারণ 'বিষয়→গদ্য→পাঠক'—সাহিত্যিক পরিজ্ঞাপনের এই ক্রমটিই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। একালে আমরা হয়তো 'বিষয়→ব্যক্তি→গদ্য→পাঠক'—এই ক্রমটি সম্বন্ধে বেশি সচেতন হয়েছি। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈলীচিন্তা তাঁর দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের আর-এক অভিজ্ঞান।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. দ্র. ডেল্ হাইম্‌স, "The Ethnography of Speaking". জোশুয়া এ ফিশম্যান (সম্পা.) ১৯৭০, *Readings in the Sociology of Language*, The Hague Paris, Mouton, pp. 99—138.

২. এফ. এল. লুকাস আরিস্ততল থেকে ব্যক্তি ও শৈলীর সমীকরণ বিষয়ে ভাবনা লক্ষ করেছেন। দ্র. F. L. Lucas, 1964, *Style*, London, Pan Books Ltd., pp. 39-40.

৩. দ্র. Crystal, David and Derek Davy, 1969, *Investigating English Style*, Bloomington etc., Indiana University Press.

৪. দ্র. Leo Spitzer, 1967, *Linguistics and Literary History*, Princeton, N. J., Princeton University Press, p. 19.

৫. দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.), 1969, Bankim Rachanavali, Vol. III, Calcutta, Sahitya Samsad, p. 97.

৬. এই নিবন্ধে আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ব্যবহার করেছি। সেই সঙ্গে, আমাদের বানান একালের রীতি অনুসারে করেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের সব বানান রাখিনি। আমাদের ব্যবহৃত 'কমলাকান্ত' ১৩৭০-এর চতুর্থ সংস্করণ।

৭. ওই, ৩১ পৃ।

৮. তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৯. ওই, ৪৪ পৃ।

১০. "সংবাদ প্রভাকর"-এ ১০ জুলাই ১৮৫২ তারিখে মুদ্রিত কিশোর বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাংশ। দ্র. "বিবিধ", ১৩৭০ সংস্করণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ৭৬ পৃ।

১১. "গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক", তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, 'বিজ্ঞাপন' ১০ পৃ।

১২. "বিবিধ প্রবন্ধ", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৮০, ৩১২-৬০ পৃ।

১৩. শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি, ১৮৭৮/১৯২৭, "Bengali Spoken and Written" দ্র. *Selected Articles*, pp. 1-67. মূল প্রবন্ধটি *Calcutta Review*-তে বেরিয়েছিল।

১৪. কেউ কেউ "আলালের ঘরের দুলাল"-এর ভাষাকে ভ্রমবশত চলিত গদ্য মনে করেছেন। যেমন সুহাস চট্টোপাধ্যায়। দ্র. Chatterjee, Suhas & Sipra, 1979, "Standardization of Bengali in the Social Perspective", in Annamalai, A., *Language Movements in India*, Mysore, Central Institute of Indian Languages, p. 29. সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের 'যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে' সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" লেখা—"বাঙ্গালা ভাষা"-র এই মন্তব্য থেকে ওই বিভ্রান্তির আরম্ভ।

১৫. দ্র. নগেন্দ্রনাথ সোম, ১৯২০, "মধুস্মৃতি" ৯৭-৯৮ পৃ।

১৬. পূর্বসূত্র, ৩৫৭ পৃ।

১৭. দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পা.) পূর্বসূত্র, pp. 103-24.

১৮. ওই, 107 পৃ।

১৯. ওই, 108 পৃ।

২০. পূর্বসূত্র, ৩৫৩ পৃ।

২১. ওই, ৩৫৬ পৃ।

২২. ওই, ৩৫৭ পৃ।

২৩. ওই, ৩৫৪ পৃ।

২৪. ওই।

২৫. ওই, ৩৫২-৬০ পৃ।

২৬. ওই, ৩৫৯ পৃ।

২৭. "ধর্মতত্ত্ব", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭১ সংস্করণ, ৬৪ পৃ।

২৮. পূর্বসূত্র, ৩৫৯ পৃ।

২৯. ওই, ওই।

৩০. ওই, ওই।

৩১. ওই, ৩৫৮-৫৯ পৃ।

৩২. ১৪ মার্চ, ১৮৭২ তারিখে লেখা চিঠি, দ্র. Bagal, J (ed), পূর্বসূত্র, p. 170.

৩৩. ওই, p. 182.

৩৪. "বিবিধ প্রবন্ধ", পূর্ববৎ, ১৯৩ পৃ।

৩৫. দ্র. "বিবিধ", বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮০ সংস্করণ, ১৫৯ পৃ।

৩৬. ওই, ১৬৯ পৃ।

৩৭. ওই, ১৭৩ পৃ।

৩৮. ওই, ১৭৪ পৃ।

৩৯. ওই, ওই।

৪০. ওই, ওই।

৪১. ওই, ১৩৫ পৃ।
৪২. ওই, ১৩৮ পৃ।
৪৩. দ্র. গোপালচন্দ্র রায়, ১৮৮১, "বঙ্কিমচন্দ্র", কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, পরিশিষ্ট ৩০ পৃ।
৪৪. "বিবিধ", পূর্ববৎ ১৪৩ পৃ।
৪৫. "ধর্মতত্ত্ব" পূর্ববৎ, ১৪০ পৃ।
৪৬. "বিবিধ", পূর্ববৎ, ১২৯ পৃ।
৪৭. ওই, ওই।
৪৮. ওই, ওই, ১৩১ পৃ।
৪৯. ওই, ওই।
৫০. ওই, ৯৫-৯৬ পৃ।
৫১. "বিবিধ প্রবন্ধ", পূর্ববৎ ১৯২ পৃ।
৫২. ওই, ওই।
৫৩. "ধর্মতত্ত্ব", পূর্ববৎ, ১৪০ পৃ।
৫৪. "বিবিধ প্রবন্ধ", পূর্ববৎ, ৩৫৯ পৃ।
৫৫. দ্র. "ধর্ম ও সাহিত্য", 'বিবিধ প্রবন্ধ', পূর্ববৎ, ১৭০ পৃ।
৫৬. "বিবিধ প্রবন্ধ", পূর্ববৎ, ৩৯ পৃ।
৫৭. 'লেখকগণও ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা ও রুচি অনুসারে কেহ বা সাহিত্যের ভাষাকে লৌকিক ভাষার অভিমুখে, কেহ বা বিমুখে লইয়া যাইবেন, সে বিষয়েও বাদানুবাদ বৃথা', দ্র. "বাঙ্গালা ব্যাকরণ", 'শব্দকথা' (১৯১৭) বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (সম্পা.) 'রামেন্দ্রসুন্দর রচনাসমগ্র' ১৩৮২ কলকাতা, গ্রন্থমেলা, ১১২ পৃ।
৫৮. ওই, ১০৪ পৃ।

ব্রহ্ম

হরপ্রসাদ মিত্র

কিছুতে প্রাণে জাগে না যদি হঠাৎখুশি-ঝরনা
কেবলি পথে সকল পথে জ্যামজট,
কেবলি রাজনীতির প্যাঁচে মন হবেই জন্তু,
হাঁটিয়ে পায়ে ধরিয়ে দেয় অপরিসীম শ্রান্তি—
এবং গণতন্ত্র নামে ভোটের বকযন্ত্রে
অশিক্ষায় কুশিক্ষায় সহমরণ নিশ্চিত।

বধ্যভূমি টানে আমাকে-তোমাকে,—সে তো বুঝছি।
তবু তামাম দুনিয়াময় প্রভূত জনবৃদ্ধি।
প্রেম কোথায়? কে বলেছেন—শ্যাম-সমান মৃত্যু?
কে বলেছেন—পরম যিনি, তিনি ঈশ্বরাত্মা?

নাস্তিকের করুণা খাঁটি, আস্তিকের বিশ্বাস—
কিছুই যদি না পাও তবে কিসের জোরে বাঁচবে?
ধর্মনিরপেক্ষতার মানে কে জানে সত্যি?
সংবিধানে সবাই জানে আত্মারাম নাস্তি।

কৃষ্ণচূড়ার-রাধাচূড়ার লালে-হলুদে মিশিয়ে
খর-দুপুরে কুবোপাখিকে অটুট তালে ডাকিয়ে
যিনি কবিতা বানান, তিনি ধুরন্ধর ব্রহ্ম।

দূরে কোথাও যাওয়া

বিপ্লব মাজী

আমি চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে যেতে অনেক দূর, আমি তাই একা
সবুজঘাসের মতো ভোর, বাতাবিলেবুর মতো নরম তোমার চোখ
মসৃণ বাদামি গ্রীবা যেন নদীর কোনো বাঁক সুদূরে কোথাও চলে গেছে
সেখানে দু ফোঁটা শিশিরের মতো আমার নিঃশব্দ চোখের জল···

যদি তোমার ছায়ার ভেতর ছায়া হয়ে হারিয়ে যাই ভুল ভেবো না,—
তুমি বরং এঁকো একটা ফুল বা একটা পাখি বা শামুকের ছবি—
মানুষের হৃৎপিণ্ডের তলায় যন্ত্রণার যে স্তব্ধ নীলমশাল তাও তুমি আঁকতে পার,
যারা দুঃখিত তাদের দুঃখের পৃথিবী কিছুতেই আর ফুরোয় না···

আমাকে যেতে হবে আরো অনেক দূর, নিজেকে জীবনের মধ্যে তবেই হয়তো দেখতে পাব,
আমি যেন র‍্যাডার, পৃথিবীর দৃশ্যগুলো ছায়া-ছায়া আমার ভেতরে ঘুরে চলে যাচ্ছে,
পাশে যখন কেউ থাকে না আর, সে নির্জনে আমি স্তব্ধতার সঙ্গে কথা বলি,
কথা বলি তোমার অন্তরঙ্গতার ভেতর কীভাবে বেঁচে থাকি মানুষের মতো···

বিষ

রমেন আচার্য

বৃষ্টির জমা জল খুব ধীরে শুষে নেয় মাটি,
খুব ধীরে ধীরে। যেরকম লোমকূপ দিয়ে
বুকের ভিতরে যায় জ্যোৎস্নার প্লাবন, সেরকম।
সেখানে হাইড্রেন চেয়ে কেউ চিৎকার কোরো না।

সংসারে দেয়াল তুলে ভাই ভাই আলাদা হয়েছে,
কাঁটাতারে সীমান্ত চিহ্নিত করে ভূ-খণ্ড হয়েছে পৃথক।
বোমা ও বুলেটে ছিন্নভিন্ন মানুষের রক্তে আজ
কাদা হয়ে উঠেছে পৃথিবী।

মাটির উপরে কান্না, ধোঁয়া ও বারুদ, আর পদতলে
পরস্পরের ওমে গায়ে গায়ে লেগে আছে মাটি।
সমস্ত সীমান্ত ভেঙে ঢালু হয়ে নেমে গেছে
একাত্মবর্তী অবিচ্ছেদ্য মাটির সংসার।
সেখানে কে বসাতে চেয়েছে শালগুঁটি।
সেখানে ফাটল নেই, নেই সাপ ও ইঁদুরের
বক্র কানাগলি। তাই বৃষ্টির জমা জল শুষে নিতে
মাটিরও কিছুটা দেরি হয়। যেন
লোমকূপ দিয়ে অনিচ্ছায় সে পান করেছে
পৃথিবীর যাবতীয় বিষ।

রাত্রির মানুষ

সুব্রত সরকার

সারাদিন আমাকে বিভিন্ন অপদেবতাদের সঙ্গে লড়তে হয়
ভোরবেলা,
সূর্যের আলো পৃথিবীকে একটু ঠেলা দিলে
গড়াতে-গড়াতে অন্ধকার গর্তে যতক্ষণ সে স্থির না হচ্ছে
স্লিপ খেয়ে পড়ে যেতে-যেতে আমি গ্লোবের পিঠ আঁকড়ে ধরে
থেকে যাবার চেষ্টা করি।
এই পরিশ্রমে আমার জামা-কাপড় ও চিন্তা ময়লা হয়ে গেছে
ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে দুর্ধীর নারায়ণ দেখা যায়
গরিব-গুর্বোদের প্রতি কেন যে এত মায়ের-ইচ্ছা থাকে
সম্ভবত তাদের তেল বের করে নেবার এ একটা প্ল্যান
আমি মাথা ঠাণ্ডা রেখে যত এর নিগূঢ়-তত্ত্ব বুঝতে চাই
পৃথিবী ততই স্পীডে ঘোরে, আর আমার চোখ থেকে মুষলধারে
আলকাতরা বেরিয়ে আসে,
দুনিয়ার দর্শন মাথার উপরে কা-কা করে ডাকছে
যে বিশ্বাস করতে চায় করুক।
আমি দেখি পশ্চিম দিগন্তে আজকের সুন্দর দিনটিও
ধোঁয়ার মতো উপরে উঠে যাচ্ছে
ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে আমাদের কলোনিকে দেখি
ভাসতে-ভাসতে চলে যেতে, কিন্তু ধরে রাখার উপায় জানা নেই।
আসলে এটাও আর একটা প্ল্যান
বইপত্রে এসবের কিস্যু লেখা নেই, শুধু মিথ্যেকথা
আর লোক-ঠকানো বড়ো-বড়ো বাত।

কাজী নজরুল—স্মৃতির পাতা থেকে

প্রথম পরিচয়

সুধীর সেন

তখন আমাদের ছন্দচর্চা আর সাহিত্যালোচনা ধীরে-ধীরে জমাট বেঁধে উঠছিল। এমন সময় একদিন সন্ধেবেলা বীরেন সেনগুপ্ত মশাই এলেন আমাদের বাড়িতে একজন বিশিষ্ট তরুণ অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে। এই অতিথি সবেমাত্র তাঁদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন এক বন্ধুর সুপারিশে। বীরেনদা ছিলেন ছোটোখাটো, গোলগাল মানুষ, পরনে নিখুঁত বাঙালি বাবুর পরিচ্ছদ—ধুতি, পানজাবি, পাম্প শু। অতিথি দীর্ঘকায়, ঋজু, শ্যামবর্ণ, মাথায় একরাশি কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল, বড়ো-বড়ো চোখ, পরিচ্ছদ অর্ধসামরিক—প্যান্ট, হাতকাটা জামা, কোমরে বেল্ট, পায়ে নাগরা-গোছের জুতো। বীরেনদা পরিচয় করিয়ে দিলেন: হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম।

এমন একজন অ-সাধারণ অভ্যাগতকে পেয়ে আমরা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলাম। তাঁর বিষয়ে আরো খবর জানবার জন্য উৎসুক হলাম। বীরেনদা বললেন, তিনি বছর তিনেক ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ছিলেন। সে-সময় পশ্চিম এশিয়াতে ছিল তাঁর স্থিতি এবং সেখানে তিনি হাবিলদার-পদে উন্নীত হন। যুদ্ধাবসানে তাঁকে ফিরে আসতে হয় করাচিতে। কিছু দিন পরে ওখানকার বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয় (১৯২০, মার্চ)। সে সঙ্গে তাঁর সৈনিকজীবনও শেষ হল। তখন তিনি চলে আসেন কলকাতায়।

কাজী চুপ করে বসে ছিলেন, বাহ্যত গম্ভীর, অথচ তার সঙ্গে ছিল অস্থিরতার লক্ষণ, একটা গুমোট ভাব। তবে তিনি যে সাধারণ ছাঁচে-ঢালা মানুষ নন তা সহজেই আঁচ করেছিলাম। তাঁর কুমিল্লায় আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ কী, কেমন করেই বা বীরেনদার অতিথি হলেন, সে সম্বন্ধে মনে কিছু কৌতূহলের উদ্রেক হয়েছিল। তবে গায়ে-পড়ে সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলা আমাদের সঙ্গত মনে হয় নি। বহুকাল পরে বিদেশে বসে দৈবাৎ কাজী নজরুলের জীবনী

এই নিবন্ধের লেখক ড. সুধীর সেন বর্তমানে আমাদের মধ্যে আর নেই। তাঁর দুটি নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি চতুরঙ্গ দপ্তরে জমা থাকা অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এর মধ্যে একটি নিবন্ধ নভেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এইটিই আমাদের দপ্তরে জমা থাকা তাঁর শেষ পাণ্ডুলিপি। এই জুন মাসে কবি নজরুলের জন্মলগ্নে লেখাটি ছাপতে গিয়ে ড. সুধীর সেনের কৃতির কথা আমরা স্মরণ করছি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

পড়ে কুমিল্লায় তাঁর প্রথম আগমনের পটভূমিকাটি জানতে পারলাম।

সে সময় কাজী নজরুল থাকতেন কলকাতায় অস্থায়িভাবে এবং সংযুক্ত ছিলেন ওখানকার সাহিত্য-সমিতির সঙ্গে। সেখানে তাঁর আলাপ হয় আলী আকবর খান নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে, যাঁর বাড়ি ছিল কুমিল্লা মহকুমার দৌলতপুর গ্রামে। খানের আমন্ত্রণে কবি একদিন এসে হাজির হন দৌলতপুরে (১৯২১, এপ্রিল)। ওখানে তাঁর প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয় খানের এক ভাগনি নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে (১৭ জুন, ১৯২১)। নানা কারণে সে বিয়ে টেঁকসই হয় নি—বিয়ের রাতেই কাজী দৌলতপুর থেকে কুমিল্লায় চলে আসেন। বন্ধুদের যোগাযোগে তিনি এসে হাজির হন বীরেনদার বাড়িতে। সেখানে সবাই তাঁকে সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবে গভীর হৃদ্যতার সঙ্গে বরণ করে নেন। ঘটনাটি আদৌ শ্রুতিমধুর নয় বলে তাকে তখন যথাসাধ্য ধামাচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল।

বীরেনদা কাজী নজরুলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'তিনি একজন সৈনিককবি বলে খ্যাতি-লাভ করেছেন। কবিতা রচনা আর সাহিত্যসেবাই এখন তাঁর আসল পেশা। এরই মধ্যে তিনি অনেক কবিতা আর গল্প প্রকাশ করেছেন। পশ্চিম এশিয়ার সৈনিক হিসেবে থাকার সময়ও তিনি ওখানকার বিষয় নিয়ে কয়েকটি অতি সুন্দর এবং অতি জোরালো কবিতা লিখেছেন।'

এবার আমাদের কৌতূহল দমন করা কঠিন হল। বড়দা তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁর কবিতা শোনাতে। কাজী তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে আবৃত্তি শুরু করলেন। ঘর গমগম করে উঠল। সেদিন কাজী যে-কবিতা শুনিয়েছিলেন তার মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে তিনটি :

—শাত-ইল-আরব! শাত-ইল-আরব!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর
—ওই ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের
দামাল ছেলে কামাল ভাই
কামাল তু নে কামাল কিয়া ভাই!'
—ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।

তাঁর সেই আবৃত্তির দৃশ্যটি এখনো যেন চোখের সামনে ভাসে। ঋজু, লম্বকায় সৈনিককবি দণ্ডায়মান সৈনিকেরই মতো, ডান কনুইটি প্রায় বুকের সঙ্গে ঘেঁসা, প্রসারিত হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ, শুধু দীর্ঘ, পুষ্ট তর্জনীটি সটানভাবে বাড়ানো, পিস্তলের ডগার মতো, তারপর তার ডাইনে-বাঁয়ে সঞ্চালন নৃত্যশীল ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে। "শাত-ইল-আরব" কবিতাটির বেলা তর্জনীচালনা ছিল সংযত, মন্থর; কণ্ঠস্বরেও ফুটে উঠেছিল গভীর দরদ।

কিন্তু "ওই ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই" বলার বেলা তর্জনীচালনা গেল অনেক বেড়ে, আর সঙ্গে-সঙ্গে নিজেও যেন খেপে উঠলেন। সেই ক্ষিপ্ত আর উদ্দীপ্ত ভাব নিয়েই তৃতীয় কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। তর্জনীচালনাও চরমে উঠল যখন বললেন—

এই দিনই মিনা ময়দানে
পুত্রস্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন খরিয়ে নে
রেখেছে আব্বা ইব্রাহিম্ সে আপ্না রুদ্র পণ।
ছিছি কেঁপো না ক্ষুদ্র মন!
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন!

যখন বললেন, 'রেখেছে আব্বা ইব্রাহিম্ সে আপ্না রুদ্রপণ', তখন মনে হল যেন একটা পিস্তল থেকে পরপর পটপট করে ছটি গুলি বেরিয়ে গেল।

বীরেনদা বিদায় নিলেন তাঁর অতিথিসহ। ঘর এবার নিঝুম। শুধু মনে গেঁথে রইল সৈনিককবির তর্জনীচালিত নৃত্যচঞ্চল উত্তপ্ত আবৃত্তি চিরদিনের জন্য।

বিদ্রোহী

কাজী কুমিল্লায় সবসুদ্ধ ছিলেন প্রায় তিন হপ্তা। সে সময় নানা লেখা নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, বাইরের সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রায় কোনো যোগ ছিল না। কুমিল্লা থেকে কাজী আবার কলকাতা ফিরে যান। ওখানে গিয়ে রচনা করেন তাঁর "বিদ্রোহী" কবিতা এবং প্রথম তা ছাপানো হয় "মুসলিম ভারতে"। তার অল্প পরেই তিনি আবার কুমিল্লা আসেন (নভেম্বর, ১৯২১)। সে সময় সারা দেশ জুড়ে হরতালের আয়োজন হয়। উপলক্ষ: প্রিন্স অব ওয়েলসের (পরে অষ্টম এডওয়ার্ড) ভারত ভ্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তিনি বম্বেতে অবতীর্ণ হন ১৭ নভেম্বর, কুমিল্লায় হরতাল পালিত হয় তার চারদিন পরে। সে উপলক্ষে কাজী নজরুল রচনা করলেন তাঁর "জাগরণী" গান। তারপর মিছিলের সামনে থেকে এই গানটি গেয়ে সারা শহর পরিক্রমণ করলেন।

সে সময় বীরেনদা আবার কাজীকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন। আমরা তাঁর নূতন কবিতা শুনতে চাইলাম। তিনি আবৃত্তি করলেন তাঁর সদ্যোরচিত "বিদ্রোহী" কবিতাটি, আদ্যোপান্ত। আবার সেই তর্জনীচালনা, সেই উন্মাদনা। আমরা তন্ময় হয়ে শুনলাম। কয়েক হপ্তা পরে সাপ্তাহিক "বিজলী"তে কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সারাদেশে শোরগোল পড়ে যায়। প্রচুর প্রশংসা এবং কিছু অনিবার্য অপবাদ মাথায় নিয়ে এবার কাজী নজরুল বাঙলার সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন।

এই কবিতায় কাজী যে কেবল ভাবরাজ্যের বহু শৃঙ্খল চূর্ণ করলেন তাই নয়। তিনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দকেও তার প্রচলিত প্রথার বন্ধন হতে মুক্তি দিয়ে তাকে নিয়ে গেলেন এক উন্নত স্তরে। রবীন্দ্রনাথ "বলাকা", "শাজাহান" ইত্যাদি কবিতায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে বৈচিত্র্যময় মুক্তবন্ধ প্রবহমান কবিতার প্রবর্তন করে-ছিলেন, কাজী নজরুল সে পদ্ধতিই মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পূর্ণোদ্যমে চালু করে দিয়ে বাঙলার সুধীসমাজকে অবাক করে দিলেন। তার পংক্তিগুলো হল অপূর্ণ একপদী (দুই মাত্রা) থেকে অপূর্ণ পঞ্চপদী পর্যন্ত। অপূর্ণ পদগুলোও বৈচিত্র্যবহুল, আর তার সঙ্গে রয়েছে মিলের নৈপুণ্য। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল তার হ্রস্ব দীর্ঘ, স্বরব্যঞ্জনের (বড়দার পরবর্তী কালের পরিভাষায় "মুক্তদল" ও "রুদ্ধদল"-এর) অপূর্ব সমাবেশ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

বল বীর (০+২)
চির উন্নত মম শির (৬+২)
শির নেহারি আমারি নতশির ওই
শিখর হিমাদ্রির (৬+৬+৬+২)

• • •

আমি সন্ন্যাসী সুরসৈনিক (৬+৪)
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক (৬+৬+৪)
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস (৬+৪)
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ!
(৬+৬+৪-প্রথম ছটি পদে ১২-টি স্বর)

• • •

আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি
(৬+৬+৬+২ সবশুদ্ধ ১৬-টি স্বর)
আমি বহ্নি-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি, কালানল
(৬+৬+৬+৪, যুক্তাক্ষরগুলি লক্ষিতব্য)

• • •

আমি বিদ্রোহী রণক্লান্ত, (৬+৩)
আমি সেইদিন হব শান্ত, (৬+৩)
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে
ধ্বনিবে না, (৬+৬+৬+৪)
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।
(৬+৬+৬+৪)

• • •

বহুরূপী বিদ্রোহীর বহুবিধ আত্মবর্ণনার মধ্যে কবির নিজের স্বরূপটিও উদ্ঘাটি হয়েছে—সবচেয়ে

বেশি বোধ হয় চারটি লাইনে :

আমি নৃত্যপাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।
আমি ত্বরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে
সব বাঁধ!

সেদিন মনে হয়েছিল, এ কবিতাটি যেন কাজী নজরুলেই মূর্তিমন্ত প্রতিচ্ছবি। বিদ্রোহীর "নৃত্য-পাগল" স্বভাব অভাবনীয় রূপে প্রকাশ পেয়েছে এই বল্গাহীন, নৃত্যশীল, সমিল, যণ্মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, যা বাঙলা ভাষায় আর কোনো উপায়ে সম্ভবপর হত বলে মনে করি নে। ভাব এবং তার বাহনের এমন অপূর্ব সমন্বয় এ কবিতাটিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

তার সঙ্গে রয়েছে মিলের কৌশল বা কেরামতি। কবি নজরুল যে শুধু মিলের ভক্ত ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন তার অক্লান্ত অনুসন্ধানী। খুশিমতো মিল দিতেন তোয়াক্কাহীন, বেপরোয়াভাবে। "বিদ্রোহী" কবিতায়ই তার দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন হিন্দোল-তিন-দোল, চেঙ্গিস-কুর্নিশ, আইন-'নাইন', "সত্যাগ্রহ" কবিতায় রয়েছে "দুরাশির রোমকাসীর"। আর তাঁর কাছেই তো শুনেছিলাম—

এই যে রে তোর হিন্দুয়ানি,
দাম নহে তার তিন দু-আনি।

তাঁর দিকে তাকিয়ে সে সময় মনে হত যেন তাঁর চোখে রয়েছে স্বপ্ন এবং অগ্নি, যেন প্রকৃতি তাঁর সমগ্র সত্তাকেই তৈরি করেছিল সর্বোপরি এ দুইটি উপাদান দিয়ে।

বীরেনদার মুক্ত প্রেম

বীরেন সেনগুপ্ত ছিলেন ঈশ্বর পাঠশালায় ইংরেজির মাস্টার, অনেকটা আধুনিক ধরনের। তাই ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ। মাস্টার-ছাত্রের মামুলি দূরত্ব ডিঙিয়ে। তার মধ্যে আমি ছিলাম তাঁর সব-চেয়ে প্রিয়ছাত্র। একরকম ছাত্রবন্ধু, বয়সের অনেকটা ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও। তাকে আমি ডাকতাম বীরেনদা বলে, আর পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হত নানা বিষয়ে, বিশেষ করে সামাজিক সমস্যা নিয়ে।

তিনি ছিলেন "মুক্ত প্রেমে"র উপাসক এবং প্রচারক। আমাকে গভীর অনুভূতিসহ বোঝাতেন, কেন ছেলেমেয়েদের অবাধে মেলামেশা করতে দেওয়া উচিত, কেন ঘটকালি বা সম্বন্ধ করে তরুণ-তরুণীর বিয়ে দেওয়া অন্যায়, তাদের প্রতি অবিচার, এবং তাতে জীবনে কেন সুখের হানি হয়, বহুক্ষেত্রে নানা অনর্থেরও সৃষ্টি হয়। স্বয়ং-নির্বাচন এবং স্বয়ং-বরণ তাদের জন্মগত অধিকার। সে অধিকার সমাজকে মেনে নিতেই হবে।

আমি সব শুনতাম মনোযোগী ছাত্রের মতো, অল্প কথায় বা মাথা নেড়ে সায় দিতাম। বীরেনদা জানতেন না যে, এ ব্যাপারে আমাকে বিশদভাবে বোঝাবার তেমন প্রয়োজন ছিল না। কারণ এটা দীক্ষিতকে একই মন্ত্রে নূতন করে দীক্ষা দেবার মতো।

আমি আঁচ করেছিলাম, বীরেনদার এই মুক্ত-প্রেমের অভিযান নিছক থিওরি-ভিত্তিক নয়, তার পিছনে ছিল তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। তিনি ছিলেন মননশীল, চিন্তাজগতে বিচরণ করা এবং নিজের খেয়ালমতো সাহিত্য-রচনা ছিল তাঁর স্বভাব। সেখানে সহধর্মিণীর সহযোগিতা থেকে তিনি ছিলেন বঞ্চিত, কারণ তাঁর স্ত্রী বহুগুণসম্পন্ন হলেও উচ্চ-শিক্ষালাভের সুযোগ পান নি। ফলে তাঁর জীবনে থেকে যায় একটা মস্ত বড়ো শূন্যতা। আর সে শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়ে যায় মুক্ত-প্রেমের দমকা হাওয়া।

সে হাওয়ার একটি অজ্ঞাত উৎস ছিল, তা কিছুদিন পরে জানতে পারলাম বীরেনদার কাছ থেকেই। তিনি আকৃষ্ট হন একটি রূপসী বিধবার দিকে, বয়সে তাঁর

চেয়ে কিছু ছোটো, তবে শিক্ষিতা। তার পরে শুরু হয় তাঁদের গোপন পত্রালাপ। বলা বাহুল্য, এই পত্রবিনিময়ে মধ্যস্থ কেউ ছিল না। তাই বীরেনদা নিজে নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বনির্ধারিত স্থানে নিজের চিঠি রেখে আসতেন এবং যথাসময় যথাস্থান হতে তার জবাব তুলে নিয়ে আসতেন। এই মুক্তপ্রেম গুপ্ত রাখা বীরেনদার পক্ষে খুব সহজ ছিল না, তার প্রকাশবেদনা অচিরে দুঃসহ হয়ে উঠল। তাই আমাকেই তিনি বাছাই করে নিলেন দরদি এবং নিরীহ শ্রোতা মনে করে। ফলে আমি হয়ে গেলাম মুক্ত প্রেমের গুপ্ত পত্রালাপের তৃতীয় অংশীদার।

কিছু রঙিন উপক্রমণিকার পর একদিন বীরেনদা আমার হাতে কয়েকখানি চিঠি তুলে দিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত হাসি জোর করে চেপে বাধ্য ছাত্রের মতো মন দিয়ে চিঠি পড়া আরম্ভ করলাম। পাশে বসে বীরেনদা ছটফট করতে লাগলেন। খানিক বাদে কৃত্রিমভাবে চোখ রাঙিয়ে আমাকে বললেন, 'এগুলো কিন্তু শুধু মনের মিলের কথা, ভাবের আদান-প্রদান, তার সবটাই প্লেটোনিক!'

বীরেনদার স্ত্রী এই প্লেটোনিক কাহিনী সম্বন্ধে কিছু জানতেন কিনা আমি জানি নে। আমার জানবার কোনো উপায় বা ইচ্ছে ছিল না। তবে একথাও ঠিক যে আমরা আমাদের নারীদের নাড়িনক্ষত্র, তাঁদের অ্যানটেনার প্রখরতা সম্বন্ধে অবহিত নই এবং বহু-ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে তার অবমাননা করি। আমার নিজের ইনটুইশন বলে যে, বীরেনদার স্ত্রী তাঁর ইনটুই-শন দিয়ে এ ব্যাপারের অনেকটাই অনুমান করেছিলেন, তবে চুপ করে থাকতেন হিন্দু ঘরের সতীসাধ্বী রমণীর মতো। কারণ তাঁরা এসব ক্ষেত্রে ভালোভাবেই বুঝেন, পতির সুখেই পত্নীর সুখ, নহিলে বিপদ বাড়ে!

বীরেনদার প্লেটোনিক বেদনা অনেক সময়ই প্রকাশ পেত করুণ সুরে। তিনি ভালো গান করতেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে চলত নিজের গুনগুনানি। আর আমাকে একা কাছে পেলে তা ফুটে উঠত গানে। তাঁর বহু-দরদ-দিয়ে-গাওয়া ছটি গানের কথা মনে পড়ে: 'আমার তৃষিত তাপিত চঞ্চল চিতে নাথ হে ফিরে এসো'! দ্বিতীয় গানটি ছিল—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল,
হতভাগিনী!

তিনি গাইতেন প্রাণ ঢেলে, তবে গলা চেপে। আর সে গানের আমি ছিলাম একমাত্র নীরব, নিরীহ শ্রোতা।

মুক্তপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষা

১৯২২ সনের জানুয়ারিতে কাজী নজরুল কুমিল্লা আসেন, তৃতীয় বারের জন্য। এবার তিনি বীরেনদার বাড়িতে ছিলেন বেশ কিছুকাল। সে সময় বীরেনদার বোন প্রমীলার সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর প্রণয়সম্পর্ক। তাঁকে লক্ষ করেই তিনি লিখলেন তাঁর "বিজয়িনী" কবিতা, যাতে ছিল—

হে মোর রাণি! তোমার কাছে হার মানি আজ শেষে।
আমার বিজয়-কেতন লুটায় তোমার
চরণ-তলে এসে।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী,
দিনে দিনে ক্লান্তি আনে হ'য়ে উঠে ভারী,
এখন এ-ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি
এই হার-মানা-হার পরাই তোমার কেশে॥

"কবি-রাণী" কবিতাটিও সে সময়ই রচনা করেন, নিশ্চয়ই প্রমীলা দেবীকে উদ্দেশ্য করেই। তাতেও সৈনিককবি লিখলেন—

তুমিই আমার মাঝে আসি
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি।

এই প্রণয়সম্বন্ধ প্রকাশ পেতে বেশি সময় লাগে নি। তারপরে প্রকাশ্যতই কথা উঠল দুজনের পরিণয়ের।

বীরেনদা মাথায় হাত দিলেন। হঠাৎ যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তাঁর সাদর অতিথিপরায়ণতার পরিণাম হবে এজাতীয় পরিণয়! তা ছিল তাঁর কল্পনাতীত। তাঁর সগর্বে প্রচারিত মুক্তপ্রেমের জীবনদর্শন বাস্তবের সঙ্গে প্রথম সংঘাতেই মূর্ছা গেল। এই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তিনি হলেন অগ্নিমূর্তি। বীরেনদা অবশ্য তাঁর মানসিক ভারসাম্য পরে অনেকটা ফিরে পেয়েছিলেন, তবে অতি ধীরে-ধীরে এবং বহুদিন পরে।

এই প্রস্তাবের ফলে বীরেনদার বাড়িতে হুলস্থুল পড়ে যায় এবং শহরেও তা ছড়িয়ে পড়ে। কাজী নজরুল তখন কলকাতা ফিরে যান এবং সেখানে নানাপ্রকারে সাহিত্য-রচনায় ব্যাপৃত হন। সে বছরই অগস্ট মাসে "ধূমকেতু" বলে অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়। তার সারথি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সেপটেমবর মাসে পূজা-সংখ্যায় কাজী প্রকাশ করেন তাঁর "আনন্দময়ীর আগমনে"-নামক কবিতাটি, ব্রিটিশ রাজের উপর সুস্পষ্টভাবে কশাঘাত করে। ফলে রক্তচক্ষু সরকার হুকুম দিলেন "ধূমকেতু"র এই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত করতে, আর জারি করলেন নজরুলের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।

আদালতে কাজী নজরুল নিজে পেশ করলেন তাঁর জবানবন্দি। "রাজবন্দীর জবানবন্দী" "ধূমকেতু"-তে এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে পুস্তকাকারে প্রকাশ পায়। ফলে দেশে নূতন করে হইচই পড়ে গেল। তাঁর ভাগ্যে জুটল একদিকে প্রচুর খ্যাতি আর সমবেদনা, আরেকদিকে বিচারের রায় হিসেবে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। তিনি জেল থেকে মুক্তি পান ১৯২৩ সনে (১৫ ডিসেমবর)। কারাবাসের সময়ও তাঁর বিদ্রোহ এবং কবিতা-রচনা দুই-ই অক্ষুণ্ণ ছিল। হুগলী জেলে থাকার সময় তিনি ৩৯ দিন অনশন-ধর্মঘট করেন রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে। অন্যান্য কবিতার সঙ্গে রচনা করেন "শিকল পরার গান", নিজেই তার সুর দেন, জেলের মধ্যে সবাই মিলে কোরাস করে এই গানটি গাইতেন।

কারামুক্তির পরে আবার স্বাভাবিকভাবে চলল তাঁর অস্বাভাবিক জীবন। কয়েক মাস পরে তাঁর রণক্লান্ত জীবনে শুরু হল এক শান্তোজ্জ্বল অধ্যায়। বছর দুই অপেক্ষার পর প্রমীলাদেবীর সঙ্গে তাঁর পরিণয় সুসম্পন্ন হয়—কুমিল্লায় নয়, কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়িতে (২৫ এপিল, ১৯২৪)।

"শ্যামের বাঁশরী"

১৯২২ সনের জানুয়ারির পরে কাজী নজরুলের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। তবে বড়দার কাছ থেকে তাঁর খবর পেতাম। বড়দা ছিলেন নজরুলের থেকে ঠিক দু বছরের বড়ো। তাঁদের মধ্যে কুমিল্লায় যে হৃদ্যতার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, তা পরে আরো দৃঢ় হয়। আমার দীর্ঘ প্রবাসবাস আরম্ভ হবার আগে (সেপটেমবর, ১৯২৮) কাজীর লেখার সঙ্গে নিজেও পরিচয় রাখার চেষ্টা করতাম। মনে আছে যখন তার লেখনী থেকে পরপর কোমল, প্রণয়সিক্ত রচনা বার হল, তখন আমার মনে দেখা দিয়েছিল এক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। বিদ্রোহী কবির ভূমিকায় অত বড়ো পরিবর্তন কল্পনা করতে পারি নি। মনে হল তিনি যেন আমাদের ডুবালেন। তাঁর ক্ষিপ্ত লেখনী বাঙলার তরুণসমাজে একদিন যে দীপ্ত আশার বাণী জাগিয়ে তুলেছিল, তা যেন হঠাৎ অন্তর্ধান করে গেল। সেই ক্ষোভ আর বৈরাগ্য সেদিন প্রকাশ পেয়েছিল নিজের একটি যৌবনসুলভ চপল রচনায়:

ওগো সৈনিক কবি!
বাংলা দেশের আশার গগনে মূর্তিমন্ত রবি!
'কামাল পাশার' লেখক যে-জন, 'বিদ্রোহী' কবিতার,
'প্রলয়োল্লাস', 'মার আগমনী' অদ্ভুত দান যাঁর,
বাংলার মাঝে ধূমকেতু সম হয়েছে যাঁহার
নূতন অভ্যুদয়,
এখনো কি তাঁর দিতে হবে পরিচয়?

* * *

ওগো বাংলার বিদ্রোহী!
বাংলার দশা দেখ আজ দেখ চাহি!
জীবনের ব্রত কর, তুমি তারে জাগাবে ধরণীতলে,
অন্তর তার জাগ্রত করি ভরিবে নূতন বলে।
রেখে দাও তব 'পিয়ার কাহিনী' আজ,
রেখে দাও তব 'শ্যামের বাঁশরী' আজ,
বীরের মতন দাঁড়াও উঠিয়া আজি এ বঙ্গ মাঝ।
'শ্যামের বাঁশরী' ফেলে দাও দূরে,
দাঁড়াও লইয়া হস্তে অগ্নিবীণা।
বাজাও তোমার সে রণতূর্য,
কোমলে তোমার জাগিয়া উঠুক ঘৃণা।
তোমার বীণার গম্ভীর রবে পাগল করুক সবে,
বীরের মতন উঠিয়া দাঁড়াক ভবে।
ডম্বরুতানে ধ্বনিত করিয়া বাংলার চারিদিক
পরিচয় দাও শক্তির তব, আমার সাধের নবীন সাহিত্যিক!
(২২ শ্রাবণ, ১৩২৯)

বিদ্রোহী কবির বিরুদ্ধে আমার এই বিদ্রোহের কথা ভাবলে হাসি পায়। আমার জীবনে সেটা ছিল উন্মাদনার যুগ। কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবী দলে যোগ দিই নি সত্য, কিন্তু তাই বলে দেশপ্রীতি আর দেশোদ্ধারের জন্য আমার মনে উত্তেজনার অভাব ছিল না। তাই আমার জীবনদর্শনও ছিল নিতান্তই একতরফা। তাই দেশপ্রেম ছাড়া আর কোনো প্রেমকে সে যুগে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করতাম না। আমার এই মজ্জাগত একচোখোমির ফলে "বিদ্রোহী" কবিতায় কবির আদিরসাত্মক বিদ্রোহের দিকটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এই বিদ্রোহী কবিই তো একদিন নিঃসংকোচে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন—

আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম, আমি ধন্যি।

* * *

আমি অভিমানী চির ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়।
আমি চুম্বন-চোর কম্পন আমি থর-থর-থর
প্রথম পরশ কুমারীর।

আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা তার কাঁকন চুড়ির কন্-কন্।

এর পরে "পিয়ার কাহিনী", "শ্যামের বাঁশরী", প্রভৃতি রচনা পড়ে আমার বিস্মিত এবং কাজীর প্রতি বীতরাগ হবার কোনোই কারণ ছিল না, একমাত্র নিজের সে-সময়কার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্কীর্ণতা ব্যতিরেকে।

স্বভাবকবি

বছর দুই আগে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী বন্ধু অনিলকুমার মিত্র সস্ত্রীক এসেছিল আমাদের নিউ ইয়র্ক আস্তানায়, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিহির ও তার পরিবারসহ। তারা প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক ও সঙ্গীত-অনুরাগী খগেন্দ্রনাথ মিত্রের দুই পুত্র। মিহিরের কাছ থেকে কাজী নজরুল সম্বন্ধে তখন একটি ঘটনার কথা শুনেছিলাম। ছোটো হলেও তা মর্মস্পর্শী এবং কাজীর চরিত্রের উপর সুন্দর আলোকপাত করে। তাই তার উল্লেখ করছি।

মিহিরের বয়স তখন হবে দশ-এগারো। একদিন বিকেলবেলা ছুটে বসবার ঘরে ঢুকেই দেখে তার বাবা একজন অভ্যাগতের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর মাথায় একরাশি চুল, সুপুরুষ, সৌম্যমূর্তি।

মিহিরের বাবা বললেন, 'জানিস্ ইনি কে? ইনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম। প্রণাম কর্।' মিহির কাজীকে প্রণাম করল। কাজী তাকে কাছে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

মিহির নাম বলল।

'তুমি এ নামের অর্থ জান?'

মিহির জবাবে বলল, 'সূর্য'।

শুনেই কাজী লিখলেন একখণ্ড কাগজে—

তোমরা কচি, তোমরা মুকুল, তনুর কিশলয়ে
তোমরা সূর্যকলি, প্রকাশ হবে সূর্য হয়ে,

তোমরা মানুষ ভগবানের তোমরা প্রতিনিধি,
আনন্দধাম লুকিয়ে রাখে তোমাদের ঐ হৃদি,
বড় হয়ে মানুষ হ'য়ো, অভয় দিয়ো ভীতে,
আনন্দধাম আসবে নেমে মাটির পৃথিবীতে,
আমরা করতে পারি নি যা তোমরা তাহা করো,
ফুলের মতো ফুটে উঠে ফুলের মতই ঝ'রো।

আমাকে এই কবিতাটি পাঠাবার সময় মিহির একটি চিঠিতে লিখেছে, তার নামের মানে যেই বলা হল, 'তখনই উনি আর এক মুহূর্ত না ভেবে ঝরঝর করে ঐ আট লাইন কবিতা লিখে ফেললেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, মাঝে একবারও ওঁর কলম থামে নি।'

আমি অবাক হই নি। কাজী নজরুল ছিলেন স্বভাবকবি। তাই ভাব অনেক সময়ই তাঁর মন থেকে বেরিয়ে আসত কবিতার আকারে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফোয়ারার মতো এবং তা অবাধে গড়িয়ে যেত চারিদিকে। অথবা তিনি তাঁর মনের রত্নাগার থেকে খেয়ালমতো তুলে আনতেন রকমারি রত্ন, রুক্ষ হীরক-খণ্ডের মতো (শেক্সপীয়রের ভাষায় বলা যায়, rough-hewn from nature), আর তাই সানন্দে তুলে ধরতেন লোকচক্ষুর সামনে। ভাবের রত্নকে ঘসে-মেজে মসৃণ করা তাঁর স্বভাব ছিল না।

খেয়ালি বিধি

নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও কাজী নজরুল দেশবাসীর কাছ থেকে শ্রদ্ধা, খ্যাতি ও সম্মান পেয়েছিলেন প্রভূত পরিমাণে, বিশেষ করে তাঁর জীবনের সায়াহ্নবেলায়। কেবল পান নি কোনোদিন সত্যিকারের সুখ। তাঁর রোগক্লিষ্ট, দরিদ্র্যনিপীড়িত জীবনের কথা ভাবলে মনে হয়, সরস্বতীর বরপুত্র হয়েও তিনি যেন চিরকাল লক্ষ্মীর আশীর্বাদ হতে বঞ্চিত থেকে গেলেন। একদিন বিদ্রোহী কবি সদর্পে বলেছিলেন, 'আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ কবির ভিন্ন!' সেই খেয়ালি বিধিই যেন তার প্রতিশোধ নিল নির্মমভাবে এবং তাঁর জীবনকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে গেল।

কাজী নজরুল তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণে বলেছিলেন: 'যদি আর বাঁশী না বাজে, আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন; মনে করবেন, পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।' (৫ এপ্রিল, ১৯৪১) অশান্ত তরুণ, পূর্ণতার তৃষ্ণা, অপূর্ণতার বেদনা—এই তিনটি কথা দিয়ে কাজী নজরুল লিখে গেছেন নিজের জীবনচরিত।

বাঁশি একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল ১০ই জুলাই ১৯৪২ সনে। মুখর কবি হলেন বাক্‌শক্তিহীন। তবু আজীবন বিষের বাঁশি বাজিয়ে নিদারুণ বিষাদের দিনেও তিনি যে প্রেরণা ও আনন্দ বিতরণ করে গেছেন বাঙালি তা ভুলতে পারে না।

জীবনমন্থন বিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

রবীন্দ্রনাথের এই কথা কাজী নজরুলের বেলা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য।

৩০শে মে ১৯৮৯
নিউ ইয়র্ক

রদবদলের পৃথিবী

সাধন চট্টোপাধ্যায়

যখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা, লিলি চৌধুরী চেয়ার ছেড়ে উঠব-উঠব করছেন, টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্তর, ফাইল, টীচার্সদের একগাদা সাব্জিসবুক, আলোর অভাবে চোখে দেখছেন না যখন ভালো করে, কারণ আকাশে বৈকালিক ধূসরতা গাঢ়, তায় লোডশেডিং, গরম—ভদ্রলোক পরদা ঠেলে ঢুকলেন, সঙ্গে এক অনুচর। দীর্ঘ ভারি শরীর, ঘিয়ে বুশশার্ট, হাতে অ্যাটাচি, গোলগাল ভরাট মুখ। সারা দিনের আতপ-ক্লান্তির চিহ্ন আছে জামায়, ঘামে এবং গাল-গলা-চোখের মেদকুঞ্চনে। সিঁথির দুপাশের চুল ধোঁয়াটে সাদা—কলপটা পুরোনো হয়ে গেছে।

—চিনতে পাচ্ছেন? যেভাবে তাকিয়ে আছেন ভয় পেয়ে যাচ্ছি!

অনুমতির তোয়াক্কা না করেই চেয়ার টেনে বসলেন মেরুদণ্ড সোজা রেখে; পকেটে ডটকলমটি সারাদিনের দৌড়ঝাঁপে এখন হেলে আছে। অনুচরটিও পাশের চেয়ারে কাঁচুমাচু।

ওনার চোখের তারায় বয়সের ছোপ পড়েছে যদিও, দাপট ও পদাধিকারে এখনও বেশ ঋজু চাউনি।

'বসুন!' বলতে গিয়ে লিলি চৌধুরী থমকে গেলেন, উনি তো বসেই পড়েছেন। তবে? বড়দিদিমণির চাউনিতে বিস্ময় স্পষ্ট। না চিনতে পারার উগ্রতা এতই প্রকট, আহত হবার যথেষ্ট কারণ কাছে ওনার মতো ব্যক্তির।

—আমি কে. পি. সান্যাল। ডি. আই. ছিলাম এ জেলার! তখন তো যেতে হত আমার কাছে। কী, মনে পড়ছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।···প্রথমটায় ঠিক···আপনার চেহারা কিছু পালটে গেছে!

—হতেই পারে। চেয়ারে নেই তো এখন! মি. সান্যাল হাসলেন। সূক্ষ্ম খোঁচাটুকু বুঝতে লিলি চৌধুরীর অসুবিধেই হল না। লজ্জা পেলেন। সত্যিই তিনি অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারে চিনতে পারেন নি মি. সান্যালকে। বিনা অনুমতিতে এভাবে সরাসরি

ঢুকে পড়ার নীরব অভিযোগ স্পষ্টত ছিলই তাঁর দৃষ্টিতে, চেহারার আভিজাত্য না থাকলে 'বাইরে বসুন!' হয়তো বলেই ফেলতেন। ভাগ্যিস!

মি. কে. পি. সান্যাল ছিলেন এ জেলার ডি. আই. —স্কুল-পরিদর্শক। ডাকসাইটে, ঝানু অফিসার। কত স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকার চোখের জল নাকের জল একাকার করে দিয়েছিলেন গ্র্যান্ট, ফাইল সই করা, পোস্ট-স্যাংশন ইত্যাদি-ইত্যাদিতে। ঘর থেকে কত শিক্ষককে বার করে দিয়েছেন!—কে ঢুকতে বলল এখন? বাইরে দাঁড়ান! বাজখাঁই আদেশে বাধ্য করতেন চলে যেতে। কখনওবা চোখ নাচিয়ে, বাঁকা ঠোঁটে—'নিমতা হাইস্কুল? ও কমিটি বাতিল! অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসবে!' বলেই ধমকে উঠতেন বিরক্তিতে—কে বসবে? সেটা আমার সিদ্ধান্ত।

কখনও বা সরাসরি ফাইল ছুঁড়ে দিয়ে, প্রভূত ক্ষমতার দীপ্তিতে বলতেন—আগে দেখি, বুঝি, তারপর তো স্কুল স্যাংশন! আমার বাড়িতে দেখা করবেন।

—স্যার, পাঁচ-ছ বছর ধরে টীচাররা বিনে পয়সায় সার্ভিস দিচ্ছে···।

—আপনারা পেয়েছেন কী? ধমকের মেজাজেই বাঁকা পথ বাতলে দিলেন—বললাম তো বাড়িতে দেখা করবেন। আমি ব্যস্ত এখন!

ওনার চেয়ারটা ছিল গদির, পেছনটা সাদা টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে ঢাকা। মুখ গুঁজে লিখতে-লিখতে জবাব দিতেন; বিশেষ মুখ বা ঘনিষ্ঠতা ছাড়া চোখ তোলারও প্রয়োজনবোধ ছিল না, দাঁড় করিয়ে রাখতেন টেবিলের ওপাশে।

লিলি চৌধুরী এ স্কুলে হেডমিস্ট্রেসের ভার নেয়ার পরে-পরেই মি. সান্যাল প্রমোশন নিয়ে শিক্ষা-অধিকার বিভাগে চলে যান। বর্তমানে একজন ডেপুটি। বয়স এখন ঠিক-ঠিক ৫৭ বছর ৩ মাস। ৫৬ বছর বয়সে, গুরুতর অভিযোগে বিভাগীয় সাসপেন-শনের জন্য মামলা ঠুকেছেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং হাইকোর্টের নির্দেশে পুরোনো স্কেলে বেতন পাচ্ছেন বটে, ব্যাপারটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত, ফাইল সই বা ক্ষমতা প্রয়োগে বঞ্চিত। ৯ মাসের মধ্যে রায় না বেরোলে, জিতলেও চেয়ারে বসতে পারবেন না—অবসর।

সম্ভবত বার ছয়েক ওনার মুখোমুখি হয়েছিলেন বড়দিদিমণি। তখন তিরিশ-বত্রিশের মহিলা—মেয়েই বলা চলে—স্কুলের আইনকানুন রপ্ত হয় নি, ওনার মতো অফিসারের সামনে কেঁচো হতেই হবে। লিলিদির স্মরণে আছে, মাত্র বার দুই দেখা, খুব খারাপ ব্যবহার পান নি। ভিড় এড়িয়ে নিরিবিলিতে ওনার ঘরে দেখা করতে বলতেন।

—'টেবিলের ওপাশে কেন? এখানে বসুন। কই দেখি, কী প্রবলেম হল! পাশের চেয়ারে বসিয়ে ফাইল ঠিকঠাক করে সই করে দিয়েছেন। মাত্র বার দুই! তাও আজ কত বছর? তেরো কি চোদ্দ। লিলি চৌধুরী আজ পোক্ত, প্রতিষ্ঠিত হেডমিস্ট্রেস। পাঁচ-ছ জন ডি. আই. বদল হয়ে গেছে এ জেলার।

তখন রঙটা ছিল ওনার প্রখর গৌরবর্ণের। চোখের ক্ষিপ্রতা আরও উজ্জ্বল। সে কি আজকের কথা? এত বছর বাদে, আচমকা এই আবছা বিকেলে ভুল হতেই পারে। এটা লিলিদির ইচ্ছাকৃত বিস্মরণ বা উপেক্ষা প্রকাশের কৌশল নয়। কিন্তু উনি কি সহজভাবে নিলেন?

হালকা রঙের তাঁতশাড়িটা সামান্য কাঁধের পাশে সরিয়ে। টেবিলের কাগজের স্তূপ মুহূর্তে পরিষ্কার করে, মি. সান্যালের প্রতি সম্মান জানালেন হেসে—বলুন!

—স্কুল-বই গছাতে আসি নি।

—না, না! তা ভাবছি না।

—ভাবা স্বাভাবিক। তবে স্বার্থ যে একেবারে নেই, তাও নয়। বাঁধানো দাঁতে হাসলেন উনি।

—চা খাবেন? না কেন? এক্ষুনি আনিয়ে দিচ্ছি। আপনার মতো মানুষ আমার স্কুলে এসছেন···! টেবিলের কোণে পুশ করতেই খেয়াল হল বিদ্যুৎ নেই; পাশের ঘরে দপ্তরিকে ডাকলেন সামান্য উঁচু গলাতে।

মি. সান্যাল ঘরের চার দেয়ালে চোখ ঘোরালেন —আলমারি, বইয়ের র‍্যাক, কী ধরনের মহাপুরুষের টাঙানো ছবি ইত্যাদি ইত্যাদিতে। অস্বস্তি বোধ করছেন। লিলিদি যতই স্বাভাবিক হচ্ছেন, সান্যাল ভাবছেন শত্রুশিবিরে বসে আছেন। তার পুরোনো দাপটকে সামান্য মহিলাটি যেন শীতল ভদ্রতার মোড়কে থোঁচা দিচ্ছেন। স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন সান্যাল।

—আপনার চেহারা কিন্তু খুব একটা পালটায়নি।

—তাই? লিলিদি হাসলেন।

—বেশ ত্রাইট লাগছে। আগের হেডমিস্ট্রেস বেঁচে আছেন?

—না। ওই যে ফটো দেখছেন।

—উনি বছবার আমার কাছে গেছলেন।

—হবে তা!

মি. সান্যাল অনুভব করলেন তাঁর প্রতিটি কথার মুখ কি অদ্ভুত স্বাভাবিকতায় সংক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষের মুখে কেবল হাসি। চা এল। উনি চুমুক দিলেন। লিলিদিও তালে তাল মিলিয়ে সিপ দিচ্ছেন —যেন মি. সান্যালের মতো মানুষকে উলটো চেয়ারে পেয়ে মজা দেখছেন।

—চলেই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম স্টেশনের কাছে স্কুল, ঘুরে যাই।

—হ্যাঁ, খুব কাছেই।

অগত্যা গম্ভীর মুখে সরাসরি অ্যাটাচির জোড়া-চাবি টিপলেন—খটাং।

—বইয়ের ব্যাপারেই। তবে স্কুলপাঠ্য নয়।

—তবে?

—মহাভারত। রিটন্ বাই মি।

—আপনি? বাঃ! এ পরিচয় তো জানতাম না?

—চেয়ার আমার সব পরিচয় নয়, মিসেস চৌধুরী। সাহিত্যের ছাত্র, গল্প-উপন্যাসের চর্চাও

ছিল, ভাবলাম মহাভারতের ঘটনাগুলো সাজিয়ে লিখলে কেমন হয়। শুধু ঘটনাগুলো! খুব সহজ ইংরিজিতে!···আপনাকে একথানা রাখতে হবে।

লিলিদি বকবকে মলাটের বইখানা তুলে দু-চার পাতা উলটে হেসে বললেন—টি. ভি.-র পপুলারিটি দেখে?

ভেবে বলেন নি, কিন্তু প্রশ্নটি খোঁচা হয়ে গেল।

—মোটেই না। প্রতিবাদ করলেন মি. সান্যাল। আমি দশ বছর ধরে পরিশ্রম করছি। টি. ভি. তো হালের। রাজশেখর আছে জানি, আমার বই অবাঙালিরাও পড়তে পারবে। ব্যবসার দিকটা ছেড়ে দিলেও, মহাভারত আমাদের জীবনে···।

—তা ভাবছি না। লিলিদির ছোট্ট জবাবে মি. সান্যাল থেমে যান। চেয়ারে থাকার সময় এভাবে কথা থামিয়ে দেয়ার সাহস কেউ পায় নি।

—রাখতেই হবে? লিলিদি হাসলেন।

—অবশ্যই! পুরোনো অভ্যেস হঠাৎ সামলে নিলেন, রিকোয়েস্ট! নিজের লেখা বলে নয়, ইংরিজিটা লুসিড। তা ছাড়া, আমি দেখেছি মহা-ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিশাল এপিক পৃথিবীতে আর নেই। গ্রীক বলুন, ইহুদি বলুন, কিংবা চীনা—মহাভারতের ধারে-কাছে আসে না।

—দাম কত?

—বেশি নয়, পঁয়ষট্টি। পনেরো পার্সেন্ট কমিশন!

—কমিশনটা কম।

—বেশি সম্ভব নয়। ষাট-সত্তর হাজার ঢেলেছি। নিজের টাকা। সারা জীবনের পুঁজি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ···সত্যি কথাটা বললুম।

—রিটার্ন পেলেন কিছু?

—হাজার পঁয়ত্রিশ। প্রত্যেকটি স্কুল রেখেছে। কাজটা তো খারাপ হয় নি, কী বলেন? লিলি চৌধুরী উলটেপালটে দেখলেন সত্যিই ইংরিজিটা প্রাঞ্জল, সাহিত্য-রসমণ্ডিত। বইয়ের পেছনে ওনার ছবিসহ পরিচয়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.।

মি. সান্যাল বললেন—ভেবেছিলাম জীবনে সাহিত্যিক হব। হল না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হল গিয়ে ভূমিকম্প, ভেতরের কোয়ালিটি উলটেপালটে দেয়। আপনার কী বিষয়?

—অঙ্ক। কমিশন বাদ দিয়ে কত হল?

—৫৫ টাকা ২৫ পয়সা।

—ওটা পুরোই করুন।

—সে কী? ওসব করা যাবে না। বিল রেডি।

—কেন যাবে না? সাড়ে পাঁচটায় স্কুলের ক্যাশ খোলা থাকে? পকেট থেকে দিলাম, কাল ভাউচার করব। খুচরো নেই।

—ভাঙিয়ে দিচ্ছি।

—বললাম তো, ৫৫ টাকা। লিলিদির অর্থময় হাসিটি অম্লান।

মি. সান্যালের দীর্ঘশ্বাস, চোখের দাপট, সংযত হাসিতে সামলে নিলেন—

নিতাই, বিলটা ঠিক করে দাও।

লিলিদি টেবিলের বাঁ দিকে ঝুঁকে ড্রয়ার খুলে ব্যাগেও চেন টানতে-টানতেই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে টের পেলেন ডান কাঁধের স্খলিত আঁচলের ফাঁকে, কোমরের ভাঁজও স্তনে চাউনির সুড়সুড়ি। তাড়াহুড়ো নেই তবু। ঠিক-ঠিক ৫৫ টাকার দুটি নোট নিতাইয়ের দিকে ছুঁড়ে চেয়ারটা বাঁকিয়ে বসলেন। মেঝেতে শব্দ হল। মনে পড়ল, নির্জন বিকেলে ওনার ঘনিষ্ঠ চেয়ারের পাশে ফাইল খুলতে-খুলতে এভাবেই বিরক্ত বোধ হত। পাছে সই আটকে যায়—বলা যেত না কিছু। বাইরে বেরিয়ে সমস্ত শরীর রি রি জ্বলত।

স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই লিলিদি ফের বইটা হাতে তুলে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি পিটার ব্রুক-এর মহাভারত দেখেছেন? কেমন লাগল?

—ওই, মানে ইয়ে, যাকে বলে···আপনারটা শুনি?

—মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

—আমরাও।

লিলিদি বুঝলেন সান্যাল এসব খোঁজ রাখেন না। হঠাৎ দশাসই চেহারা অতিথিটি উঠে পড়তে, আলোচনা বন্ধ। দিদিমণি আগাগোড়া চেহারায় চোখ বুলিয়ে নিলেন মজার ভঙ্গিতে। চেয়ারে বসেই বিদায় জানালেন—আসবেন!

—আপনাদের ব্যস্ত সময়·····ডিসটার্ব করা কি ঠিক?

—না, না, এসব একঘেয়ে কাজ, জানেন তো। স্কুলে সর্বদা শীতের বাতাস নিয়ে থাকি। আপনারা এলে তবু বসন্তের ঝলক লাগে।

'আপনারা' 'বসন্তের ঝলক' শব্দগুলোর সান্যালের কাছে সরাসরি বিদ্রূপ মনে হল।

—বাঃ! কে বলে আপনি অঙ্কের মহিলা! পাকা-পোক্ত সাহিত্যরসিক!

সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় দাঁড়াতেই নিতাই লক্ষ করল মি. সান্যালের মুখটি থমথম করছে, এক্ষুণি কেটে পড়বে।

—দুটো বিল ইচ্ছে করে কাটাল। বাধা দিতে পারতেন।

মি. সান্যালের ঠোঁটে সিগারেট, কয়েক সেকেনড ব্যবধানে জবাব দিলেন—কিছু জীবজন্তুর শীতকালে চর্বি গজায়, আবার ঝরে যায় গরমে! দেখা যাক! চেয়ারে বসতে দাও!

—ভানুবাবু এর চেয়ে বেটার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ফাস্ট বল স্পিনের চেয়ে ভালো। আই লাইক ইট।

আজই দুপুরে, গঙ্গার ধারের পুরোনো স্কুলটার প্রধান শিক্ষক ভানু মজুমদার হাতের মুঠোয় পেয়ে সরাসরি আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

—আসুন! আসুন। সান্যালকে মনে নেই? আপনি তো কিলার···খুনি! তারপর আঙুল উঁচিয়ে নিতাইকে হুকুম দিয়েছিলেন—আপনি পাশের ঘরে বসুন!

মি. সান্যালও ঘাবড়ে যান নি।

—কিলার? কী বলতে চাইছেন?

—আপনি একজনের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ।

—আপনি উইথড্র করুন। সান্যাল তেড়েফুঁড়ে উঠতেই, প্রধানশিক্ষক ঠাণ্ডা মেজাজে বললেন—তরুবালা বসুকে মনে পড়ে? শতদল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা? বিধবা পেনশনের কটি টাকার জন্য অফিস, আদালত আর স্কুলে ছুটতে-ছুটতে জুতো খইয়ে ফেলেছিলেন? একটি পয়সাও পান নি?···কিছু দিন আগে রাস্তায় হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন, জানেন কি?

—তাঁর তো বয়সের গোলমাল ছিল। পুরোনো ব্যাপার! আমি কী করব?

—আপনি ডি. আই ছিলেন যখন, বয়সের ব্যাপারটা জানতেন না? তখন মাইনে দিলেন কী করে? ব্যাপারটা অঙ্ক, প্রতিশোধ যখন নিলেন উনি অসহায়।

—মিথ্যে কথা।

—ওঁর স্বামী বি.কে. বোস বিরুদ্ধ রাজনীতির ছিল বলে? আপনার পেছনে লেগেছিল, তাই না? ওদের ম্যানেজিং কমিটি দু-দুবার আপনি ভেঙেছিলেন। আপনি তো হাইকোর্টের জোরে ষোলো বছর ওই স্কুলের প্রশাসক ছিলেন। আপনাকে তখন কতবার অনুরোধ জানিয়েছিল! ভানুবাবু এবার চোখে চোখ রেখে বললেন—শেষ জীবনে মহিলার চোখের জলও ছিল না।···একখানা বই কেনার অনুরোধ, তা আমি রাখছি···কিন্তু তরুদির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অমানবিক, মি. সান্যাল!

এরপর প্রধান শিক্ষক বইটা উলটেপালটে ইংরিজির প্রশংসা করে, চুকপি যখন কিললেন স্কুলের হয়ে, মিঃ সান্যাল হঠাৎ ভানুবাবুর হাত দুটো ধরে ফেললেন ঝপ করে—আর অপমান করবেন না এ ভাবে!

এখন, মফস্সলের রাস্তায় বিদ্যুৎহীন পরিবেশে, ফুটদখলি দোকানে-দোকানে মোম ও কার্বাইডের আলোতে, মানুষের ভিড় ঠেলে গুঁতিয়ে ট্রেশনে উঠবার সময়, মি. সান্যালের মনে হল দুপুরের এই প্রত্যক্ষ অভিযোগেও শিরায়-শিরায় আগুন ধরে নি; স্পষ্ট প্রতিবাদের সুযোগ পেয়েছিলেন। উঠবার সময় হেডমাস্টারটিকে শুনিয়েছিলেন—কিন্তু শিক্ষাবিভাগে আমার এফিসিয়েন্সি নিয়ে আপনাদের কোনো অভিযোগ ছিল কি?

মৌন সম্মতি পেয়ে বলে গেলেন—তবু ন্যায় বিচার পেলাম কোথায়? আমার চেয়ে অযোগ্য অফিসাররা রিটায়ারের পর বোর্ড, কাউন্সিল, নানা কমিশনে ঢুকে পড়েছে! আমি? মিথ্যা অভিযোগের শিকার হলাম, কেসে হারবে জেনেও কেবল ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা! আমি কি সরকারকে সেবা করতে পারতাম না?

—কেসের কী অবস্থা?

—প্রচ্ছন্ন হুমকির হাসিতে জবাব দিলেন—ফিরে আসছি! আমিও তখন বিনামূল্যে কিছু ফিরিয়ে দেব না।

দুই

মিঃ সান্যাল থাকেন লবণহ্রদের নতুন বসতি অঞ্চলে। আধুনিক ডিজাইনের দোতলা দালান। বোঝা যায় বেশ কয়েক বছর ধরে দেয়ালে রঙ অথবা সংলগ্ন বাগানে যত্নের ছোঁয়া পড়ছে না। 'কার্নিশ' বেগানভেলিয়ার শুকনো পাতায় নোংরা। বাড়ি তৈরির লোনের কিস্তি এখনও শোধ হয় নি—তারপরে মামলার খরচা। চাকরিজীবনে এসব যে ঘটবে কে বুঝতে পেরেছিল?

ঘরে ঢুকেই অ্যাটাচিটি রেখে ক্লান্ত স্বরে খোঁজ করলেন—চিঠি এসছে কোনো?

বাড়িতে মাত্র তিনটি প্রাণী। সান্যাল, স্ত্রী এবং বছর বারোর একটি জড় ভরত পুত্রসন্তান। বড় মেয়ে রিঙ্কু কলেজে পড়তে পড়তেই অডিট ফার্মের একটি

একটি রুগ্ন ক্লার্ক-ছোকরার সঙ্গে চলে যায়—চালচুলো তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মিঃ সান্যাল ওদের বিয়ে স্বীকার করেননি, আজও নিজের গোঁ ধরে আছেন। বউয়ের বয়স চল্লিশ—লেট ম্যারেজ। কলমের একটি খোঁচায় যে কোন স্কুলে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন তখন। কত ভালো-ভালো স্কুলের কর্তৃপক্ষ ওনার অনুকম্পা পাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল। নেননি। ঘর সামলাবে কে? মতলব ছিল, মেয়েটা পাশ করলেই···।

—লেটার হোল্ডারে আছে। হাত মুছতে-মুছতে মৃদুলা তোয়ালে ও পাটভাঙ্গা লুঙ্গি নিয়ে দাঁড়াল। চিঠির জন্য ছুটে যেতেই, বাধা দিয়ে বলে—আগে বাথরুমে যাও। চান করবে?

—চান? ঠাণ্ডা লাগবেনা?

—গরম জল করে দিচ্ছি। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমায়।

ভেজা চুলে তোয়ালে ঘষতে ঘষতে, আয়নার মুখোমুখি সামান্য ঘাড় দুইয়ে চিরুনি চালাল, কাঁধে-গলায় পাউডার ঢেলে চিঠির মুখ ছিঁড়ে বিছানায় গ্যাঁট হয়ে বসল কিছুটা আরামবোধ নিয়ে। একটু পরই রান্নাঘর ছেড়ে মৃদুলা। এক প্লেট পাঁপড় ভাজা ও কফি।

—কোত্থেকে? ভালো খবর কিছু?

ক্রমশ ঠোঁট চাপতে চাপতে, তুচ্ছ কাগজের মতো চিঠিটা পাশে সরিয়ে কফি ও পাঁপড়ের প্লেট তুলে নিলেন নিঃশব্দে। মৃদুলা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসার সাহস পেল না।

রাতে, খাওয়ার টেবিলে, চেয়ার সরিয়ে বসতে-বসতে 'ভাত কেন?' বলতেই, মৃদুলার জবাব—এক মুঠো। সারা দুপুর রোদে ঘুরেছ! মাছ দিয়ে খাও। নুনটা সরিয়ে রাখ, ডাক্তারের নিষেধ।

সান্যাল হেসে উপদেশটুকু মেনে নিলেন। মৃদুলা সাহস পেল না বলতে 'শুনলাম রিঙ্কু অসুস্থ!' পাছে উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

—কিসের চিঠি এসছে?

—রাবিশ! একমুখ ঝোলভাতে জবাব দিলেন। ওরা পেয়েছে কি বল তো? এই তো মাসের গোড়ায় হাজার দিলাম ব্যারিস্টার খরচ! আবার? আমি কি সাদা হাতি?

—তবু যদি হিল্লে হয় কিছু!

—ছাই হবে! সর্বত্র 'দুর্নীতি'! কী হবে এদেশের? যেখানে যোগ্যতার মর্যাদা নেই কিছু? দলবাজি আর গণতন্ত্রে পাতি মানুষগুলো অফিসারদের মাথায় চাঁটি মারছে? ···এখন দরকার কড়া মিলিটারি শাসন! হ্যাঁ, কিছুটা নিষ্ঠুর বটে, অধর্মকে দমন করতে কোনো কিছুই অন্যায় নয়···এক মহাভারতের কথা।

—কাঁটা যখন আটকে গেছে···!

—তাই বলে গলায় পা দিয়ে আদায় করবে? চাকরির সব টাকাটাই তো দুনম্বরি নয় আমার!

মৃদুলা নীরব। তারপর হাতমুখ ধুয়ে, ক্লান্তিতে মি. সান্যাল যখন নিজেই মশারি টাঙিয়ে বালিশে মাথা দিলেন, শূন্য-বাল্বের আলোকে দেখলেন মৃদুলা টেবিলে ঢাকা-জল রেখে দরজা ভেজিয়ে ওঘরে চলে গেল। এটা এতই নিয়মিত—কোথাও জ্বালা ধরল না। রাতে স্বপ্ন দেখলেন, স্কুল বোর্ডের মেম্বার হিসেবে সরকারি চিঠি এসছে বাড়িতে; লেটার হোল্ডারে রাখতে রাখতেই ঘুম ভেঙে গেল।

শেষরাতে বৃষ্টি ঝরেছিল; স্নিগ্ধ ঠাণ্ডায় চাদর জড়িয়ে বিছানার ওমে আধোচোখবোজা সান্যাল যখন রোমাঞ্চিত, মৃদুলা ভোরের চা নিয়ে উপস্থিত। মশারি তুলে উঁকি দিতেই, আচমকা দু হাতের হ্যাঁচকা টানে বিছানায় উলটে পড়ল। কোমরের চর্বি এবং স্তনে অসহ্য চাপ, ক্ষীণ প্রতিরোধের শব্দ চুড়ি, শাঁখায় এবং লিলি চৌধুরীকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার কাল্পনিক আনন্দে সান্যাল যখন চিঠির স্বপ্ন ও নির্জন-ভোরে বস্ত্রহীন, ঠোঁটের ওপর দেগে বসা বাসিমুখের দুর্গন্ধে, মৃদুলার প্রবল অনিচ্ছার মুখোমুখি দুজন জড়াজড়ি মশারি ছিঁড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

—দারুণ স্বপ্ন দেখলাম! কাপ হাতে চেয়ারে

সান্যাল তখনও হাঁপাচ্ছেন, চুল ঠিক করতে-করতে। মৃদুলা আঁচলে ঠোঁটের রক্ত পরীক্ষা করে বলল—দেখো, শিগগিরই রায়টা বোধহয় বেরোচ্ছে!

—কিন্তু স্কুলকে বাঁদর নাচিয়ে ছাড়ব। আমি কে. পি. সান্যাল! বদনামে ভয় পাই না। স্কুলের ঘটনা-গুলো এই প্রথম মৃদুলা জানতে পারে। বুঝল, প্রতি-দিন স্বামীর মেজাজ তিরিক্ষি থাকে কেন।

—অপমান ভাবছ কেন?

—পুজো করছে?

—এটা স্বাভাবিক ব্যবহারও হতে পারে!

—মোটেই না।

—মান আর অপমান। এর বাইরে কিছু নেই? এত সন্দেহ?

—ছাখো, জীবনে কম মানুষ চরাই নি। প্রশাসনটা বুঝি। বি. সি. এস, আই. সি. এসরা শুধু সই করে, সরকার চালাই আমরা। পাওয়ারে বসলে মানুষকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

—কী জানি। অত মার প্যাঁচ বুঝি না।

—ইংরেজ তো পাক্কা জাত, ঠিক শিক্ষাই দিয়ে-ছিল! প্রশাসনের প্রথম কথাই মানুষকে সন্দেহ করবে, সব সমস্যা মেটাবে না আর নিজের ক্ষমতার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

—শুধু সন্দেহ? স্বাভাবিক ভালো মানুষ তোমাদের চোখে থাকতে পারে না?

—থাকতে পারে; কিন্তু মানুষ আদতে অসৎ··· বিচারটা শুরু হবে এখান থেকেই।

ও ঘরে ছেলের আওয়াজ পেয়ে মৃদুলা চলে গেল।

আজ দুপুরে মি. সান্যাল গেলেন নিজের অফিসে। মামলা-সংক্রান্ত খোঁজখবর নিতে অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে যখন শুনলেন ফয়সালা হতে চলেছে, টাকা দেবার জ্বালা ধরল না।

—ভাবছেন কেন মি. সান্যাল! কেসটা লীলা তরফদারের এজলাসে! সরকার ওর কাছে জিততে পেরেছে কোন দিন? একটু টাকার খাই! সে তো মানতেই হবে।

—শুধু ভাবছি রিটারদের মাত্র ন মাস বাকি।

—কী করবেন বলুন, সরকার টাইম কিল করছে। কোনো ভ্যালিড পয়েন্ট নেই! স্রেফ পলিটিক্যাল শত্রুতা।

—এটাই নাকি ডেমোক্র্যাসি?

বন্ধুটি সান্যালের মন্তব্য তারিফ করে জবাব দিল—এ মাস তো কী হয়েছে? পাই পয়সা গুণে-গেঁথে দিতে হবে। তখন আপনিই মানহানি ঠুকে দেবেন একটা। মি. সান্যাল গভীর ক্ষোভ ও হতাশায় টেবিলে ঘুষি দিয়ে বল্লেন—পয়সা না হয় পেলাম, কিন্তু চেয়ার?

দু দিন পর, বেলা এগারোটায় সান্যাল তড়িঘড়ি চান ও আহার সেরেছেন। দেরি হয়ে গেছে। ব্যারাকপুর অঞ্চলে বেশ কয়েকটা স্কুল ঘোরার কথা। নিতাই অপেক্ষা করবে স্টেশনে। হঠাৎ মৃদুলার অসহিষ্ণুতা, চিৎকার। ছেলে নিঃশব্দে বিছানায় হেগে দিয়েছে। কিছু পারবে না করতে, বলেই ছাদে চলে গেছে সে।

মি. সান্যালের কপালের রগ তিনটি ধারায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষে—'আপদ মরলেও বাঁচতাম।'—বলে এ ঘরে ছেলের অবস্থাটা দেখে খানিক থমকে রইলেন। লুঙ্গি পেঁচিয়ে, সব পরিষ্কার করে, পাউডার ঢেলে দিতেই বাপের দিকে ফিক করে হেসে ছেলে ওপাশে কাত। মি. সান্যাল এ ঘরে এসে, হঠাৎ চশমাটা খুলে, চোখের গোপন জলটুকু মুছে ফেললেন; ধরা-চূড়ো ছেড়ে বসে রইলেন বিছানায়।

আধঘণ্টা পর মৃদুলা এ ঘরে ঢুকে অবাক।

—বেরোবে না?

—না! শরীর ভালো নেই।

—নিতাই অপেক্ষা করবে না?

—করুক!

—বেচারা বসে থাকবে?

—থাকবে! আচমকা মি. সান্যালের অগ্ন্যুৎপাত

ঘটল। ভেবেছে কী ও? বই ছাপতে ৪০ হাজার টাকা ধার দিয়ে মাথা কিনেছে? ফেউয়ের মতো হিসেব রাখা?

মৃত্থলা ঠাণ্ডা গলায় বলে—ওর মতো মানুষের চল্লিশ হাজার টাকা কম?

—ওর টাকা? পাইয়ে দেই নি ওকে? ওই তো লেখা-পড়া, কত স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বানিয়েছি! কত পাবলিসার্স-এর কাছ থেকে কমিশনের ব্যবস্থা করেছি। লম্পট। ওর সুপারিশে কত মেয়ের চাকরি হয়েছে। ভুলে গেছে সেসব দিন? দিয়েছে? ঠিক-ঠিক শেয়ার দিয়েছে? বলতে গেলে ও ৪০ হাজার আমারই। মুখ ফুটে বলুক তো কোনো দিন? পাতি মাস্টার! ওর কথা মতো ছুটতে হবে? বুঝুক, ও আর আমি এক মাপের নই। ঘনিষ্ঠতায় স্ট্যাটাস মুছে যায় না।

—সরাসরি বলে দাও না কেন?

—বলি না অন্য কারণে।

—ভয়?

—এসব জানোয়ার ব্ল্যাকমেইলিং তো ভালো বোঝে!

সারা বিকেল একঘেয়ে, অদ্ভুত কষ্টে কাটল! প্রায় প্রতিদিনই আজকাল হয় এগুলো। বাড়ি, স্কুল বা অফিসে কোন-কোন দিন খোঁজ নিতে এলে ভয়ানক বিক্ষত ও ফুঁশতে থাকেন মি. সান্যাল। স্বাভাবিক হওয়া যায় না। বুকের কোথায় যেন অদৃশ্য রক্ত গড়াচ্ছে। তিনি ছাড়া অন্যরা টের পাচ্ছে না। দিন, সপ্তাহ, মাস এভাবেই কেটে যায়।

তিন

অবসরের ২ মাস ১৭ দিন আগে তিনি পুনর্বহাল হলেন ক্ষমতায়। এ সময়টুকুই বা কম কি চেয়ার ফিরে পেলে? তবু মি. সান্যালের মনে হল দীর্ঘ প্রায় দু বছরের অনুপস্থিতির ধাক্কা মনের কোথায় যেন স্থায়ী আঘাত দিয়ে গেছে। পুরোনো দিনের স্বাভাবিকতা পাচ্ছেন না।

…মাস দেড়েক পরই লিলি চৌধুরীকে নতুন কিছু টীচার নিয়োগের জন্য কে. পি. সান্যালের ঘরে ঢুকতে হল।

—বলুন?

—পোস্ট স্যাংশনের ব্যাপারটা? অনেকদিন ফাইল পড়ে আছে!

কে. পি. সান্যাল তাকাচ্ছেন যেন কোনো দিন মুখোমুখি হন নি। বসতে বললেন না চেয়ারে।

—কোন্ স্কুল বলুন তো? আচ্ছা।

—মন্ত্রীর সই হয়েও পড়ে আছে আট মাস। স্কুলে অসুবিধে হচ্ছে, বুঝতেই পারছেন।

—মন্ত্রীর রেফারেন্স দেখাচ্ছেন?

লিলি চৌধুরী হেসে বললেন—কবে আসব স্যার?

—যে কোনো দিন! বুধ, বেস্পতি, শুক্র…

লিলিদি জিজ্ঞেস করলেন—চিনতে পারছেন তো? আপনার মহাভারত কেমন গেল, স্যার!

—না! বলেই বইয়ের ব্যাপারটা মুখের তুচ্ছ মুদ্রায় উড়িয়ে দিলেন। চলে যেতেই, ঘরের বাতাসে পড়ে রইল প্রসাধনের হালকাগন্ধ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মি. সান্যাল হঠাৎ বেয়ারাকে ডাকিয়ে ফাইলটা নিয়ে কী ভাবলেন যেন। মন্ত্রীর রেফারেন্স! ঠোঁট চাপলেন, কলমের ডগায় কপাল ঠুকলেন চোখ বুজে, শেষে সই করলেন—যাতে বুধবারই পেয়ে যায় লিলি চৌধুরী। আর তখনই, অদৃশ্য ঘোরটুকু মুছে যেতেই হায় হায় করলেন—ও ফাইল তো সই করার কথা নয়? এত সহজে?…

২ মাস ১৭ দিন পর, প্রতিদিনের এই স্বপ্নটুকু অবাস্তব রেখেই, সান্যাল বিদায় নিলেন। সেই মুহূর্তে মনে হল, পৃথিবীটা আদৌ বদলায় নি, তবু কী যেন ফুরিয়ে গেছে!

ভারতীয় সমাজে কর্তৃত্বকারী জাত এবং সংস্কৃতায়নের তত্ত্ব

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'সমাজ' ব্যাপারটা যাঁদের কাছে বিমূর্ত তাঁরা অনেকেই সমাজতত্ত্বকে দূর থেকে সমীহ করেন, বুকের কাছে টেনে নিতে পারেন না। আবার নিজেদের চারপাশের মানুষগুলোকে আরো ভালোভাবে চেনা আর বোঝার জন্য যাঁদের আগ্রহ তুলনায় বেশি, তাঁরা অনেকেই সমাজতাত্ত্বিকদের সংখ্যাতত্ত্বের বেড়াজাল পার হয়ে আসল সমাজের কাছে পৌঁছতেই পারেন না। সমাজতত্ত্ব তাঁদের কাছে একটি নীরস বিজ্ঞান বলে মনে হয়। অথচ এই দুই মেরুর মাঝামাঝি কোনো অবস্থান না নেওয়া গেলে সমাজের স্বরূপও যেমন অধরা থেকে যাবে, সমাজতত্ত্বও তেমনি ব্রাত্যজনের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ হলেও খুবই সময়োচিত। তবে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য এবং সর্বোপরি রসবোধ। প্রথম তিনটি গুণের অধিকারী অনেকেই, কিন্তু রসের কাণ্ডারী মাত্র কয়েকজনই। অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস সেই মুষ্টিমেয় বিরল প্রতিভাশালী ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক ও নৃ-বিজ্ঞানীদের অন্যতম, যাঁরা সংখ্যাতত্ত্বের ফুলঝুরি ছাড়াও সমাজের একান্ত আপন চরিত্রটিকে তাত্ত্বিক অথচ সরস রূপ দিতে পারেন। তাই শ্রীনিবাস যখনই কিছু লেখেন তখনই তা হয়ে ওঠে চিত্তাকর্ষক।

আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ হলেও একেবারে হালফিলের রচনা নয়। তাঁর নিজের কথাতেই, আঠারো বছর ধরে তিনি বিভিন্ন সংস্থার অনুরোধে যে-সমস্ত প্রবন্ধ রচনা করেছেন তারই একটি সংকলনগ্রন্থ এটি। স্বাভাবিক কারণেই কিছু পুনরুক্তি হলেও তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই এটিও অত্যন্ত সুখপাঠ্য গ্রন্থ এবং নিঃসন্দেহে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের চর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সংকলিত প্রবন্ধগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। দশটির মধ্যে সাতটিই ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা হয়েছে। বর্ণনা আর বিশ্লেষণের অপূর্ব সমন্বয় এই প্রবন্ধগুলি। দ্বিতীয়-শ্রেণীভুক্ত দুটি প্রবন্ধে সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকের গবেষণাপদ্ধতি সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করা হয়েছে। আর তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছে মাত্র একটিই প্রবন্ধ। কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে তা একাই একশ। আত্মজৈবনিক এই লেখার মাধ্যমে শ্রীনিবাস সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক রূপে তাঁর গড়ে ওঠার ইতিহাস বিধৃত করার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের ইতিহাসেরও উল্লেখযোগ্য দিক উন্মোচন করেছেন।

লেখকের আত্মকথনের মাধ্যমেই তাঁর লেখার জগতে প্রবেশ করা যেতে পারে। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত দুর্বলস্বাস্থ্য কিশোর শ্রীনিবাস যে ডাক্তার-ইনজিনিয়ারদের ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে সমাজতত্ত্বকেই তাঁর উচ্চশিক্ষার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন তা ভারতীয় সমাজতত্ত্বের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। ১৯৩০ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন তাঁর পাঠ শুরু করেন সমাজতত্ত্ব তখন সমাজদর্শন, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন বা সামাজিক মনস্তত্ত্বের অন্যতম অংশ ছিল। তৎকালীন উপাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অনুপ্রেরণায় বিভাগীয় প্রধান

The Cohesive Role of Sanskritization and Other Essays—M. N. Srinivas: (Delhi, OUP, 1989), Rs. 158·00.

৬

অধ্যাপক এ. আর. ওয়াদিয়া স্নাতক পর্যায়ে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠনের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন শ্রীনিবাস তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। তেমনই অকুণ্ঠচিত্তে ঋণ-স্বীকার করেছেন জি. এস. ঘুর্য়ে, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন ও ইভান্স প্রিচার্ডের অবদানের কথা যাঁদের স্নেহাশীর্বাদে শ্রীনিবাস ক্রমেই একজন অনুসন্ধিৎসু গবেষকে পরিণত হয়ে ওঠেন। ঘুর্য়ের কাছ থেকেই তিনি জনজীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজের জটিল মানবিক সম্পর্করাজির রহস্যজাল উন্মোচনের শিক্ষা-লাভ করেছিলেন। ঘুর্য়ে একক প্রচেষ্টায় তাঁর অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে যেভাবে গোটা ভারতবর্ষের নৃতাত্ত্বিক-তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেছিলেন তা একাধারে বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয়। মেকী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণে যে শ্রীনিবাস আগ্রহী হয়েছিলেন তার জন্য অনেকটাই তিনি র‍্যাডক্লিফ ব্রাউনের কাছে ঋণী। বস্তুতপক্ষে যুবক শ্রীনিবাস উৎসাহের আতিশয্যে কাঠামো-ক্রিয়াতত্ত্বের অনুরাগীই হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সমাজ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে গুরুত্বহীন বলে বর্জন করার এবং সর্বজনীন নিয়ম অনুসন্ধানের যে কোনো মানেই হয় না, পরিণত বয়সের সেই উপলব্ধির কথাও তিনি জানিয়েছেন। ইভান্স প্রিচার্ডই এ বিষয়ে তাঁর পথপ্রদর্শক। রক্ষণশীল ইংরেজ হয়েও অধ্যাপক প্রিচার্ড জাতি ও ধর্মের বন্ধন উপেক্ষা করে মানবসমাজের যে-কোনো সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন। এ যে কত বড়ো মহৎ গুণ, তা একমাত্র তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীনিবাসই জানাতে পারেন।

অধ্যাপক প্রিচার্ডের সঙ্গে শ্রীনিবাসের অবশ্য একটি বিষয়ে গুরুতর মতপার্থক্য ছিল। আধুনিক পরিবর্তনশীল সমাজ বিশ্লেষণে নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগের কার্যতা সম্পর্কে প্রিচার্ডের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন-ম্যালি-নোওস্কিদের শিক্ষার ফলেই নয়, দক্ষিণভারতীয় কুর্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং পরবর্তী কালে রামপুর গ্রামে গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেও তিনি উপলব্ধি করেন যে, আঞ্চলিক সম্প্রদায়, নৃকুলগত গোষ্ঠী বা জটিল আধুনিক সমাজের সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নিখিল-বিশ্লেষণের (macro-analysis) পাশাপাশি অংশীদারি পর্যবেক্ষণ (participant observation) ও বাস্তব অভিজ্ঞতা (fieldwork experience)-কেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বীকৃতি দিতে হবে। সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ বিষয়ে শ্রীনিবাসের মতামত জানতে আগ্রহান্বিত হলে বর্তমান সংকলনের অন্তত দুটি প্রবন্ধ অবশ্যই পড়বেন। *The observer and the observed in the study of Cultures* এবং *The Insider versus the outsider in the study of cultures* শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে শ্রীনিবাস অংশীদারি পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা-নির্ভর গবেষণার বেশ কিছু জটিল তাত্ত্বিক সমস্যা পর্যালোচনা করেছেন। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী এড্‌মাণ্ড লীচ্ মনে করতেন, একমাত্র বিদেশী বা বিজাতীয় সংস্কৃতিকেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব। কিন্তু শ্রীনিবাসের মত ভিন্ন। তিনি বিশ্বাস করেন—নির্মোহ, নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে যথার্থ নৃবিজ্ঞানী নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতিকেও অংশীদারি পর্যবেক্ষকরূপে বিশ্লেষণ করতে পারেন। আর ভারতের মতো দেশে তো চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী জন-সমাজের সংস্কৃতিই নৃবিজ্ঞানীর শিক্ষিতচোখে আকর্ষণীয় গবেষণার বিষয়বস্তু বলে প্রতিভাত হতে পারে।

ভারতীয় সমাজ আর সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা সত্যিই কোনো গবেষণা করতে চান, তাঁরা বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে এমন কিছু ইঙ্গিত পাবেন যা অবশ্যই তাঁদের গবেষণার ক্ষেত্রে নবদিগন্ত উন্মোচন করবে। *Networks in Indian social structure* এমনই একটি প্রবন্ধ যেখানে গোষ্ঠীজীবনের বাইরেও যে ব্যক্তি-মানুষের একটি জীবন রয়েছে এবং সামাজিক কাঠামোয় তারও যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে, এ কথাটিই নানা কথার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সাবেকি সীমানা আধুনিক সমাজে বজায় রাখা সম্ভব নয় বলেই ব্যক্তিমানুষও ক্রমোচ্চ সামাজিক কাঠামোর সংকীর্ণ পরিসরে আর বন্দী থাকতে চায় না। তাই তো দেখি শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ ভৃত্যস্বামী তাঁর আত্মজকে মাদ্রাজের ইনজিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করানোর জন্য যানবাহনের ব্যবসায় নিযুক্ত তাঞ্জোরস্থিত অব্রাহ্মণ-বন্ধুবর্গের সাহায্য গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন না। স্বাধীনোত্তর পরিকল্পিত অর্থনীতির যুগে নিজস্ব স্বার্থরক্ষায় সদা ব্যাপৃত আধুনিক ভারতীয় ব্যক্তিসত্তা এইভাবেই পরিবার, গ্রাম, জাত, কুল, শ্রেণী বা দলের নির্দিষ্ট চৌহদ্দিতে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে বিচিত্র আন্তর্মানবিক সম্পর্কে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছে। সমাজ-তাত্ত্বিক শ্রীনিবাসের চোখে এর গুরুত্ব অসীম। তিনি মনে করেন, যদি সঠিক তথ্য পাওয়া যায় তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কিভাবে কিছু লোক 'সম্পদ' সংগ্রহ করে রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করে, তার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে সমাজপরিবর্তনকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা যায়। মার্কসবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে এই ব্যাখ্যায় কিছুটা অতিশয়োক্তি আছে বলে মনে হতে পারে। কারণ 'মর্যাদা'-ভিত্তিক সাবেকি সমাজের পরিবর্তে 'চুক্তি'-নির্ভর আধুনিক সমাজ শুধু ভারতবর্ষে কেন, অন্য কোনো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেও পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন দাবি আমরা করতে পারি না। কাজেই শ্রেণী বা জাত-কুলের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে—একথাও জোর করে বলা যায় না। কিন্তু অর্থবিকশিত ও বিকৃত পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও যে হারে দালালির ব্যবসা ও দালালি-মানসিকতা দ্রুত বেড়ে চলেছে তাকে ব্যাখ্যা করতে হলে 'সামাজিক সম্পর্কের জাল'-সংক্রান্ত ধারণার সাহায্য আমাদের নিতেই হবে। বিদগ্ধ সমাজবিজ্ঞানীরও তো সেটাই প্রধান বক্তব্য।

তবে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে জাতপাতের ব্যাপার নিয়ে অত্যধিক মাথা ঘামানোর একটা প্রবণতা আছে। সশ্রদ্ধ চিত্তে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করেও একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অধ্যাপক শ্রীনিবাসের মধ্যেও সেই ঝোঁক আছে। তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মতো বর্তমান গ্রন্থেরও সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে জাতপাতের সমস্যা। তিনটি প্রবন্ধে প্রত্যক্ষভাবে জাতপ্রথার কাঠামো ও পরিবর্তন নিয়ে তিনি সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। দুটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু পণপ্রথা ও ভারতীয় নারীর সামাজিক মর্যাদা হলেও মূলত জাতপ্রথার আলোকেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এমনকী জনসংখ্যাবিজ্ঞানের অন্তর্গত ভারতীয় প্রজনন-সংক্রান্ত সমস্যাকেও ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণের কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন। আসলে মূলত সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী বলেই অধ্যাপক শ্রীনিবাসের রচনায় মূল্যবোধ, ঐতিহ্য তথা সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। শ্রেণী-কাঠামোর বিন্যাস বিশ্লেষণের চেয়ে তাই জাতপ্রথার বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ বেশি।

জাতপ্রথা নিয়ে শ্রীনিবাসের দৃষ্টিভঙ্গী বা বক্তব্য তাঁর অনুরাগী পাঠকমাত্রেরই জানা। কর্তৃত্বকারী জাতের ও সংস্কৃতায়নের ধারণার তিনিই মূল প্রবক্তা। বর্তমান সংকলনেও আমরা তাঁদের সুনিপুণ প্রয়োগ লক্ষ করি। *The Nature of Caste Hierarchy* প্রবন্ধে ফরাসি বিদগ্ধ পণ্ডিত লুই দুর্ম-র *Homo Hierarchicus* গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গেই কর্তৃত্ব-কারী জাতের কথা উল্লেখ করেছেন। দুর্ম পবিত্রতা-অপবিত্রতার নিরিখে জাতপ্রথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে

বর্ণপ্রথার সঙ্গে তাকে একাকার করে দিয়েছেন, ফলে নানাবিধ অসঙ্গতি অবধারিতভাবেই দেখা দিয়েছে। অথচ বিশাল দেশ ভারতবর্ষে জাতপ্রথার বৈচিত্র্য এমনই যে 'ক্ষমতা' সর্বদাই 'মর্যাদা'-র অনুগত এমন কথা আমরা বলতে পারি না। সাবেকি মর্যাদার কাঠামোয় নিম্নস্তরের হয়েও কর্তৃত্বকারী জাত যে ক্ষমতার অন্যতম মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। শ্রীনিবাস তাই যথার্থই দেখিয়েছেন যে, বর্ণপ্রথায় ক্ষমতা পবিত্রতার অনুগত থাকলেও জাতপ্রথায় অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ইহলৌকিক ক্ষমতাই মর্যাদার উৎস বলে বিবেচিত হয়। পুজুরী বামুনের চেয়ে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের উচ্চ মর্যাদা তাঁর মতকেই প্রতিষ্ঠা করে, ডুম'-র নয়।

ভারতের জাতপ্রথা সম্পর্কে খ্রীষ্টান মিশনারি ও ব্রিটিশ প্রশাসকদের প্রচারের ফলে সাধারণভাবে একটি ধারণা চালু আছে। তা হল এই যে জাতপ্রথা অনড়, অটল, সামাজিক অচলায়তনের উৎস এবং এই প্রথার ধারক-বাহক যে হিন্দুধর্ম তা অদৃষ্টবাদী জীবন-বিমুখ একটি দর্শন। রামপুর গ্রামে গবেষণা করতে গিয়েই শ্রীনিবাস এই ধারণার অসারতা উপলব্ধি করেন। তিনি লক্ষ করেন—উচ্চবর্ণভুক্ত না হয়েও সংখ্যাবহুল নির্দিষ্ট বৃত্তিজীবী জনসম্প্রদায় অর্থনৈতিক সম্পদের মালিকানার জোরে এক-একটি অঞ্চলের কর্তৃত্বকারী জাতে পরিণত হয় এবং অন্যদিকে উচ্চ-বর্ণের আচার-ব্যবহার ও জীবনধারা নিজেদের জীবনে অনুসরণ করে বর্ণ-কাঠামোতেও ধাপে-ধাপে মর্যাদা-বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়ার তিনি নামকরণ করলেন সংস্কৃতায়ন (*sanskritization*)। তাহলে কর্তৃত্বশালী জাত ও সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার যৌথ প্রভাবে সাবেকি জাতপ্রথার অচলায়তন যে ভেঙ্গে গেছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। অতএব সামাজিক সচলতা ভারতীয় জাতপ্রথায় পরোক্ষভাবেও স্বীকৃত হয়েছে। সেই সচলতারই চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়েছেন *Mobility in the Caste System* প্রবন্ধে। সচলতা ও পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপের অন্য একটি কারণও আছে। সাম্প্রতিক কালে মৌলবাদী চিন্তার প্রসারে শ্রীনিবাস অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছেন। ভারতীয় সমাজ যেন আবহমান কাল ধরে একইরকম আছে, তাই বৈদিক বর্ণপ্রথার যুগে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়—এ ধরনের স্লোগান যাঁরা তোলেন তাঁদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার সৎ সাহস দেখিয়েছেন বলেও শ্রীনিবাসের এই প্রবন্ধটি একটি অন্য মাত্রা অর্জন করেছে।

যে প্রবন্ধের নামে আলোচ্য গ্রন্থের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে সেই প্রবন্ধে শ্রীনিবাস বেশ কয়েকটি নতুন কথা বলেছেন। কারণ, আগে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার ও জীবনধারাই নিম্ন বর্ণ ও জাতের কাছে একমাত্র অনুকরণযোগ্য। কিন্তু এখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকেও তিনি সেই মর্যাদা দিতে রাজি। তাঁর মতে, সাধারণভাবে দক্ষিণভারতে ব্রাহ্মণের আদর্শ, উত্তরভারতে ক্ষত্রিয় আদর্শ, এবং পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈশ্য আদর্শ অন্ত্যজ শ্রেণীর পক্ষে অনুকরণীয় বলে মনে করা হয়। অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্বকারী জাতের জীবন-ধারাও নিম্নজাত ও হরিজনগোষ্ঠী অনুকরণ করে। কিন্তু সেই প্রক্রিয়াকে তিনি সংস্কৃতায়ন বলতে নারাজ। তবে বর্ণাশ্রমধর্ম, সংসার, কর্ম, ধর্ম, পাপ, পুণ্য, মোক্ষ ও ভক্তির সমন্বয়ে যে বৈদিক মতাদর্শ সর্বভারতীয় হিন্দু মতাদর্শ বলে প্রচারিত হয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রকোপে তা অনেকটাই ম্লান হয়েছিল। উচ্চশিক্ষা, ভালো মাইনের চাকরি, শহরের সম্পন্ন অঞ্চলে নিজস্ব বসতবাড়ি—এসব না হলে আজকাল শুধু সংস্কৃতায়নে কাজ দেয় না। একথা যেমন সত্যি, তেমনি দেশবিভাগ ও মৌলবাদের দ্বৈত প্রভাবে হিন্দু মৌলবাদের দীর্ঘ কালো ছায়া ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে যে প্রবেশ করেছে তাও অস্বীকার করা যায় না। শহুরে শিক্ষিত মানুষেরাই আজকাল বেশি করে তীর্থগমন করেন, ভজন-নামগানের ব্যবস্থা করেন, ব্রত-উপোস পালন করেন, মন্দিরে পুজো দেন। বারো মাসে তেরো পার্বণের জোয়ারে 'ধর্মনিরপেক্ষ' সমাজ ভেসে যাবার উপক্রম। সমাজপরিবর্তনের সচেতন দর্শক শ্রীনিবাস এই মৌলবাদের তথা সংস্কৃতায়নের উত্থানে স্বাভাবিক কারণেই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। তবে ভারতের সনাতন ধর্মাদর্শ যদি সংস্কৃতায়ন-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় সেই আশাতেই তিনি সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর এই মহামূল্যবান প্রবন্ধে।

বিশ্বনারীমুক্তি দশক শেষ হয়েছে বছর পাঁচেক হল। অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও এর ঢেউ এসে পড়েছে। তাই আধুনিক সমাজে ভারতীয় নারীর প্রকৃত অবস্থান-নির্ণয় নিয়েও গবেষণার অন্ত নেই। শ্রীনিবাসও তাঁর মতামত জানিয়েছেন। কিন্তু নারী-মুক্তিবাদী লেখকদের মতো উচ্ছ্বাসের আতিশয্য বা পুরুষজাতির প্রতি ধিক্কার তাঁর ধাতে সয় না। স্বাভাবিক সংযত ভঙ্গিতে তথ্যবিশ্লেষণের মধ্যে তিনি সুকৌশলী নিরুচ্চার যে মন্তব্য করেছেন তার তাৎপর্য গভীর। *Position of Indian Women* প্রবন্ধে নারীর ভূমিকা নির্ণয় করেছেন কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে পরিবারের অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে। সাবেকি কৃষিব্যবস্থার সহায়ক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের গুরুত্ব এত বেশি যে গৃহকর্ম ও মাঠে-ময়দানের কাজ, উভয়ক্ষেত্রেই স্ত্রী বা গৃহকর্ত্রী হিসেবে সমাজের সর্বস্তরেই অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং নারীর সামাজিক মূল্য যতটা কম বলে ভাবা হয়, ততটা কম নয়। তবে সংস্কৃতায়ন-প্রক্রিয়ার প্রভাবে নিম্নবর্ণ ও জাতের অন্তর্গত কৃষক পরিবারগুলি যখন বর্ণ হিন্দু পরিবারের অনুকরণে তাদের মেয়েদের পরদানশিন করে রাখতে প্রযত্ন করে, শ্রীনিবাসের মতে তখনই দেখা দেয় বিপত্তি।

পণপ্রথা নিয়েও বিপত্তি কম নয়। লেখক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তার নিন্দা করেছেন। অথচ একই সঙ্গে তার কুলপঞ্জী উদ্ধার করে বিবর্তনব্যাখ্যায়ও যত্নশীল হয়েছেন। সাবেকি সমাজে 'নীচু' জাতের মেয়ের সঙ্গে 'উঁচু' জাতের ছেলের বিয়ে দিয়ে জাতে ওঠার যে পদ্ধতি (hypergamy) প্রচলিত ছিল তার ফলেই বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছ থেকে নানারকম যৌতুক উপঢৌকন পেত। সমগ্র উত্তরভারতে এই পণপ্রথা প্রচলিত থাকলেও দক্ষিণভারতে কন্যাপণ আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। "কন্যাদান" বিবাহপদ্ধতিতেও নববধূ অন্তত "স্ত্রীধনের" উপর ব্যক্তিগত অধিকার ভোগ করতে পারত। কিন্তু *Some Reflections on Dowry* নিবন্ধে শ্রীনিবাস তাঁর মনোজ্ঞ প্রতিবেদনে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক পণপ্রথা সম্পূর্ণভাবে বাজারের শক্তি, ভোগবাদ ও নিছক লোভের ফল। "কন্যাদান" বা "স্ত্রীধনের" সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। তাই আধুনিক পণপ্রথায় মহিলারাই হয়েছেন সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার। অথচ সীতা, সাবিত্রী বা অহল্যার কাল্পনিক মহিমাকীর্তনের নামে নারীনির্যাতন অহরহ চলছে।

শ্রীনিবাসের মূল বক্তব্য যা, অর্থাৎ সংস্কৃতায়নই এখনো ভারতীয় সভ্যতার মূল শক্তি, এই মন্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত নাও হতে পারেন। কারণ, অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে শ্রেণীবিভাজন যত তীব্র হবে, ব্যক্তিমানুষের সামাজিক-ভূমিকাও তত ক্ষীণ হয়ে আসবে। তাই ব্যক্তিপর্যায়ে সংস্কৃতায়ন বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষকে পরিচালিত করলেও, শহর ও শিল্প-অঞ্চলে তার প্রভাব কমে আসতে বাধ্য। এ যুক্তি যদি আমরা মেনেও নিই, তাহলেও শ্রীনিবাস যে যুক্তির ভিত্তিতে তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তাকেও সহজে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ—একজন চিন্তাশীল যুক্তিবাদী মানুষের মানবতাবাদী মননের পরিচয় বহন করে এই সংকলনগ্রন্থটি। কিছু মুদ্রণপ্রমাদ ছাড়া গ্রন্থটি পাঠকসমাজের কাছে সাদরে গৃহীত হবার যে যোগ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

যুগোপযোগী চিন্তাপ্রসূত বঙ্কিম-সমালোচনা

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

শেকসপীয়রের তিরোভাবের চার শ বছর পরেও এই অনন্য-প্রতিভাধর স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব এবং সৃষ্টিকর্ম নিয়ে এখনও পৃথিবীব্যাপী নিত্যনতুন গবেষণার প্রয়াস চলছে। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু দৈবীপ্রতিভাসম্পন্ন স্রষ্টামাত্র নন; স্ব-দেশ, স্ব-জাতি তথা মানবসমাজের উন্নতি-কামী একজন মনীষী। সুতরাং তাঁর ভাস্বর প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে তাঁর জন্মের দেড় শ বছর পরেও যদি নতুন-নতুন চিন্তাসমৃদ্ধ আলোচনা-গবেষণা দেখা যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সৌভাগ্যক্রমে, বঙ্কিমজন্মের সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে উভয় বঙ্গের বঙ্কিম-অনুরাগী পাঠকসমাজে এই অসামান্য লেখকের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, সাহিত্যপ্রতিভা এবং বহুমুখী ভাবনাচিন্তা নিয়ে তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণাত্মক নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা আরম্ভ হয়েছে—যাকে নির্দ্বিধায় বলা যায় বঙ্কিম-ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার নবমূল্যায়ন। এ নবমূল্যায়ন প্রয়াসে গতানুগতিক চিন্তাধারার লেখক ছাড়াও আর-এক শ্রেণীর রাজনীতি-সচেতন সমালোচকের আবির্ভাব খুব প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে—যাঁদের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা সমীক্ষায় এতাবৎ কাল প্রচলিত শিল্পী এবং বঙ্কিম সম্পর্কীয় ধারণার ওপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছে। উভয় বঙ্গের যে-সমস্ত লেখক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বঙ্কিম-ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য বিচার করে পাঠকের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অরবিন্দ পোদ্দার, নারায়ণ চৌধুরী, ড. আহমদ শরীফ, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বদরুদ্দীন ওমর, শান্তনু কায়সার প্রভৃতি। শান্তনু কায়সারের "বঙ্কিমচন্দ্র" গ্রন্থখানির দ্বিতীয় মুদ্রণ মুক্তধারা সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। এই গ্রন্থখানিই আমাদের বর্তমান আলোচ্য।

মাত্র ৬২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই চটি বইখানির অন্তর্গত তিনটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে লেখকের বঙ্কিমচর্চা সমাপ্ত হয়েছে। এই সীমিত পরিসরে লেখকের বঙ্কিমচর্চা যতই আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত মনে হোক না কেন, গ্রন্থধৃত তিনটি প্রবন্ধই তাঁর স্বতন্ত্র চিন্তার দ্যুতিময় প্রকাশে বিশিষ্ট।

প্রথম প্রবন্ধ "শিল্পী দ্বন্দ্ব"-র বক্তব্য বিতর্কিত হলেও লেখকের সবল লেখনীতে তীক্ষ্ণ লক্ষ্যভেদী ভাষায় রচিত বলে তৎক্ষণাৎ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখক প্রথমেই বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বে এক সুস্পষ্ট বিভাজনরেখা দেখতে পেয়েছেন—শিল্পী-বঙ্কিম এবং ব্যক্তি-বঙ্কিম। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পাঠকদের উদ্দেশে একটি চমকপ্রদ মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়েছেন। শিল্পী-বঙ্কিম ব্যক্তি-বঙ্কিমের নিকট বারে-বারে হেরে গিয়েছেন। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি টলস্টয়ের নজির টেনে এনেছেন—যিনি (তাঁর মতে) 'বাইবেলে আচ্ছন্ন হবার পর তাঁর পূর্বেকার শিল্পকর্মকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন [দ্র বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ ৯]। টলস্টয় উত্তরজীবনে তাঁর প্রথম পর্বের বিশ্ববন্দিত শিল্পকর্মকে যে অগ্রাহ্য করেছিলেন তার কারণ, সে শিল্পকর্ম ছিল (তাঁর বিবেচনায়) অবসরভোগী 'এলিট' সমাজের মনোরঞ্জক এবং খেটে-খাওয়া জনগণের আয়ত্তের বাইরে বলে, 'বাইবেলে আচ্ছন্ন' হবার পর নয়। এই মনোভাবের কথা টলস্টয় উত্তরজীবনে বহু স্থলে ব্যক্ত করেও গেছেন।

আলোচ্য লেখকের ধারণা, ব্যক্তি-বঙ্কিমের নিকট শিল্পী বঙ্কিমের পরাজয়ের অন্যতম কারণ, শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে তাঁর আত্যন্তিক সচেতনতা। লেখকের মতে, বঙ্কিম সাহিত্যিক রুচি-প্রবৃত্তির দিক থেকেই শুধু অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিলেন না, 'কলকাতার সুশিক্ষিত ভদ্র ভূস্বামীদের একজন ছিলেন' [দ্র তদেব, পৃ ১০]। লেখক আরো মন্তব্য করেছেন, কলকাতার সুশিক্ষিত ভদ্র ভূস্বামীদের একজন ছিলেন বলে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলও তিনি লাভ করে-ছিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের এ নতুন পরিচয় লেখক কোথায় পেলেন জানতে আগ্রহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র যদি কলকাতার সুশিক্ষিত ভদ্র জমিদার-শ্রেণীর লোক না হন, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল তিনি লাভ করেছিলেন কিভাবে?—এ জিজ্ঞাসাও অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজ সরকারের প্রসাদপুষ্ট জমিদার-মহাজন-সরকারি কর্মচারী কর্তৃক শোষিত উৎপীড়িত কৃষক-প্রজাদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি সত্ত্বেও দেশের মঙ্গলার্থে ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছার ওপর আস্থা স্থাপনের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম-মানসিকতার যে দ্বৈধ ভাব প্রকাশ পেয়েছে তার তীব্র সমালোচনা করেছেন লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে। তবে শোষক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সম্পর্কে এ দ্বৈধ মনোভাব শুধু উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে বঙ্কিমচন্দ্রের মাত্র নয়, রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল বাঙালি মনীষীর। এঁরা সকলেই একথা বিশ্বাস করতেন, বিজ্ঞান শক্তি এবং আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের সাহায্যে ইংরেজ দেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের দিকে আকর্ষণ করছে। এই দ্বৈধ-মনোভাবের প্রভাবে বঙ্কিমের এক চোখ সামাজ্যবাদী ইংরেজের লুব্ধ পররাজ্যগ্রাস, শোষণ ও পীড়ন দেখে জ্বলে ওঠে, আর-এক চোখ এই প্রগতিশীল জাতির দেশের উন্নয়নমূলক নানা কাজকর্ম দেখে কৃতজ্ঞতায় এবং আশায় দীপ্ত হয়। ইংরেজের নিকট বহিরজ্ঞান লাভ না করলে ভারতবাসী আধুনিক প্রগতিশীল জাতির সমকক্ষ হতে কখনও সমর্থ হবে না—এ বিশ্বাসই বঙ্কিমকে এদেশে ইংরেজদের স্থায়িত্বকামনায় প্রবৃত্ত করেছিল এবং "আনন্দমঠ" উপন্যাসের সমাপ্তিতে মহাপুরুষ চিকিৎসকের জবানিতে তিনি তাঁর এই ঐকান্তিক প্রত্যয়ের কথা দেশবাসীর সামনে ঘোষণা করেছিলেন।

আলোচ্য লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস "সীতারামে"র দ্বিতীয় সংস্করণে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ বর্জনকে ব্যক্তি-বঙ্কিমের নিকট শিল্পী-বঙ্কিমের পরাজয় বলে যে নির্দেশ করেছেন, তার সমীচীনতা অস্বীকার করা যায় না। অতঃপর লেখক "রাজসিংহ" উপন্যাসের জেবউন্নিসা ও মবারক চরিত্র আলোচনায় মন্তব্য করেছেন—এ দুটি চরিত্র চিত্রণে শিল্পী-বঙ্কিম ব্যক্তি-বঙ্কিমকে অভিভূত না করলে এ ধরনের চরিত্রচিত্রণ সম্ভব হত না। তাঁর এই শেষোক্ত বিশ্লেষণ প্রথমোক্ত অভিযোগকে দুর্বল করে দেয় নি কি? সর্বশেষে, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তব্যের নজির দেখিয়ে আলোচ্য লেখক প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, যেহেতু বঙ্কিম নাগরিক অভিজাততন্ত্রের প্রতিনিধি, সে কারণে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকশ্রেণীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি শেষ পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়। বঙ্কিমের ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা রচনার কোথাও শ্রেণীস্বার্থ-প্রভাবিত হয়ে কৃষক জীবনের উপেক্ষার কথা কোথাও আছে বলে আমাদের জানা নেই। এ অবস্থায় উক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত,—'ব্যক্তি বঙ্কিম শিল্পী বঙ্কিমকে হত্যা করেছে'—কি পরিমাণে গ্রাহ্য তা অবশ্যই বিবেচ্য।

পরবর্তী প্রবন্ধ "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠের কয়েকটি সূত্র ও আঙ্গিক ভাবনা"য় আলোচ্য লেখকের মুক্ত দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, উপন্যাসসৃষ্টিতে বঙ্কিম রোমানটিক ইংরেজি সাহিত্য থেকে ধ্রুপদী পাশ্চাত্য সাহিত্য-প্রভাবিত হয়েছিলেন বেশি। বঙ্কিম-উপন্যাসে শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য (শৈল্পিক শর্ত, ট্যাক্ট ও শিল্পীর নির্মিতি) সম্পর্কে আলোচ্য লেখক যে সূক্ষ্ম লক্ষ্যভেদী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তা একজন প্রকৃত রসজ্ঞের পক্ষেই

বঙ্কিমচন্দ্র—শান্তনু কায়সার। মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা, বাংলাদেশ ১১০০। দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯০। পঁয়ত্রিশ টাকা।

সম্ভব। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসে স্ব-ঘোষিত নির্মাণরীতিকে অতিক্রম করে বঙ্কিম যে স্ব-বিরোধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন লেখক। এ বিশ্লেষণে বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচকের দৃষ্টি প্রত্যক্ষ।

সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি—সমাজ-সংস্কার নয়,—এই মৌলিক সত্যকে এক সময় প্রাধান্য দিয়ে নিজের রচনায় বারে বারে সমাজনীতিকে প্রাধান্য দেওয়ায় বঙ্কিম যে স্ব-বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা লেখকের তীব্র আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে লেখক পুনরায় রাজনৈতিক বিতর্কের জালে জড়িয়ে পড়ে যে-সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করেছেন, সেগুলি কী পরিমাণে গ্রাহ্য সে সম্পর্কে অবশ্য সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

উপন্যাসের আঙ্গিকনির্মাণে এবং বক্তব্যপ্রকাশে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন, বর্ণনায় সংযম এবং নাট্যরীতির আশ্রয় গ্রহণ যে বঙ্কিম-উপন্যাসকে শিল্পোন্নত পরিণতি দান করেছে লেখক উত্থাপিত সে প্রসঙ্গ বহু আলোচিত। তবে আলোচ্য গ্রন্থে লেখক যে বলেছেন, বর্ণনায় সংযমবোধের সঙ্গে বঙ্কিমের সুচিন্তিত যুক্তির উপস্থাপন, বিস্তার এবং ঋজুতা তাঁর উপন্যাসের উৎকর্ষের মূলে—এ মন্তব্য খুবই সমীচীন। "বঙ্কিম উপন্যাস পাঠের সার্থকতা কোথায়?"—এই স্ব-নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তরে লেখক যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন,—অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে সামনে রেখেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পাঠের মূল সার্থকতা (দ্র তদেব, পৃ ৪৮)। এ মন্তব্যের ভেতর নিঃসন্দেহে বঙ্কিমের ক্লাসিকধর্মী উপন্যাস, শিল্পের প্রাপ্য গৌরব ঘোষিত হয়েছে।

"ত্রয়ী" উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য: যথেষ্ট নাট্যগুণসম্পন্ন হলেও এই উপন্যাসগুলি যথার্থ মানবিকগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে নি। এ দুর্বলতার উৎসেও বঙ্কিমের ব্যক্তিক ও সামাজিক শ্রেণীগত স্বার্থপ্রবণতা বলে মন্তব্য করেছেন লেখক। দুর্ভাগ্যক্রমে এ গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগকে যুক্তিপ্রয়োগের সাহায্যে স্পষ্ট করে তোলা হয় নি। লেখক শুধুমাত্র বলেছেন, উপন্যাসোক্ত ঘটনা ও সিচুয়েশন বর্ণনায় লেখকের ঔচিত্যবোধের অভাবই উপন্যাসের দুর্বলতার মূলে। ঔচিত্যবোধ বলতে লেখক ধর্মতত্ত্বে কথিত বঙ্কিমের সমদর্শনের নীতির সঙ্গে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার অসামঞ্জস্যের প্রতিই লক্ষ করেছেন মনে হয়। কিন্তু সেটাই কি ঔচিত্যবোধের যথার্থ ব্যাখ্যা?

লেখকের মতে, মুখ্যত শ্রেণীস্বার্থের প্রণোদনায় বঙ্কিম "আনন্দমঠ" উপন্যাসের পাঁচটি সংস্করণে বহু পরিবর্তন সাধন করেন। এ অভিমত সুধীসমাজ কর্তৃক গৃহীত হলে বঙ্কিম-গবেষণার তৃতীয় পর্বে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে, সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমসাহিত্যবিচারে বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও "ত্রয়ী" উপন্যাসের প্রকৃতিবিচারে আলোচ্য লেখক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার যাথার্থ্য সর্বজনস্বীকৃত হবারই সম্ভাবনা। তিনি বলেছেন, 'অনুশীলন তত্ত্বের সমষ্টির প্রকাশ "আনন্দমঠ", ব্যক্তির বিকাশের রূপ চিহ্নিত "দেবী চৌধুরাণী"তে, "সীতারামে" এ দুইয়ের সমন্বয়ের ফসল,' [দ্র. তদেব, পৃ ৫৪]।

"আনন্দমঠ" এবং "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে তীব্র দেশাত্মবোধ এবং অনুশীলনধর্মের ফলশ্রুতিতে ব্যক্তিত্ববিকাশের আড়ম্বরময় প্রস্তুতি দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত ভক্তির নিকট আত্মসমর্পণ দেখে নিতান্ত হতাশ হয়েছেন আলোচ্য লেখক। তাঁর বিবেচনায় "সীতারাম" উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে কোনো ইতিবাচক জীবন-উপলব্ধি নেই, একটি অপরিসীম শূন্যতার মধ্যে কাহিনী পরিণতি লাভ করেছে। লেখকের বিবেচনায় 'এ অপচয় দেশপ্রেমের শক্তির এবং সম্ভাবনারও।' তাঁর বিবেচনায় স্বপ্নদর্শী বঙ্কিম সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনায় বাস্তববোধের দ্বারা চালিত না হওয়ায় অতিলৌকিক ঘটনা এবং চরিত্রসৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, বাঙালি ভারতীয় ঐতিহ্যের সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ চেতনাজগতে জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন খুঁজেছেন। এর অনিবার্য পরিণতিতে, লেখকের মতে, বঙ্কিমের "ত্রয়ী" উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছে লেখকের স্ব-বিরোধিতা, গোঁজামিল, পলায়নী মনোবৃত্তি এবং এবং ভক্তির প্রাবল্য। "ত্রয়ী" উপন্যাসের মূল্য সম্পর্কে কোনো-কোনো মনস্বী লেখকের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাক্যকে নস্যাৎ করে দিয়ে আলোচ্য লেখক যে-সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তার গুরুত্ব অপরিসীম বলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল—যা করা হয় নি বলে এই সমালোচনা সুধীসমাজে কী পরিমাণে গৃহীত হবে তা সন্দেহের বিষয়।

সত্যদ্রষ্টা বঙ্কিম স্বদেশের সার্বিক মুক্তির জন্য আত্মবিসর্জনের চাইতেও "ভক্তি"-কে যে মহত্তর ধর্ম বলে চিহ্নিত করেছেন, সে ভক্তি তাঁর বিবেচনায় নিষ্কাম কর্মেরই যে নামান্তর, আলোচ্য লেখক তা বোধ হয় ভেবে দেখেন নি। নারীর পক্ষে পারিবারিক এবং সমাজ-জীবনে সেবামূলক কর্মের অনুষ্ঠানই যে মহত্তম ধর্ম—"দেবী চৌধুরাণী"তে এ সত্য প্রচার করে বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীল এবং পলায়নী মনোভাব দেখিয়েছেন কিনা তা নিশ্চয়ই যুক্তিবাদী বিচারের অপেক্ষা রাখে। আর সর্বশেষ উপন্যাস "সীতারাম"-এর পরিসমাপ্তি ঘটেছে লক্ষ্যহীন কোনো শূন্যতার উপলব্ধিতে নয়,—মোহগ্রস্ত সীতারামের পরিপূর্ণ আত্মিক শক্তির জাগরণে—যে গভীর উপলব্ধিতে বঙ্কিমের মহৎ ঔপন্যাসিক-জীবন সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

পরিশেষে বক্তব্য, আলোচ্য লেখক বর্তমান ক্ষুদ্রায়ত গ্রন্থে বঙ্কিমচর্চার গতানুগতিক পথে বিচরণ না করে এই মনস্বী লেখকের সৃষ্টিকর্ম এবং চিন্তাধারা সম্পর্কে এমন কতগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যা চিন্তাশীল পাঠকমাত্রকেই ভাবিয়ে তুলবে। বঙ্কিমের সৃষ্টিপ্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে স্বীয় চিন্তালব্ধ যুক্তির আলোকে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার সঙ্গে সকল শ্রেণীর পাঠক একমত হবেন—এমন প্রত্যাশা করা না গেলেও যুগোপযোগী চিন্তাপ্রসূত তাঁর বঙ্কিমসমালোচনাকে মূল্য দিতে হবে।

"ভাগ হয়নিকো নজরুল"

মেঘ মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দ তাঁর প্রসিদ্ধ সতীর্থদের সহযোগে বাঙলা কবিতা রচনা ও চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন, যা রবীন্দ্রকাব্য-আদর্শ থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন। কিন্তু তাদের মৌলিকতা এবং অভিনবত্ব বাঙলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হিসেবে গ্রহণীয় হতে সময় লেগেছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রবল অস্তিত্বের মধ্যে নিতান্ত এক বিশ-বাইশবর্ষীয় তরুণ হঠাৎ কবিতা লিখে রবীন্দ্রলালিত পাঠককুলের চিত্তে যে অভিনবত্বের স্বাদ এবং নতুন চেতনার আলোড়ন এনেছিল, এককথায় বাঙালি জাতির মন জয় করে নিয়েছিল, এমনকী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেই অজানা-অচেনা-অখ্যাত-কুল বা শিক্ষাগৌরবহীন যুবাকে যেভাবে শক্তিমান কবি বলে অভিনন্দিত করেছিলেন, তার কোনো তুলনা নেই। নজরুলের আবির্ভাব বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। অল্প বয়সে আত্মপ্রকাশের পর স্বল্প দিনের মধ্যে তিনি যেভাবে তাঁর সমকালকে জয় করে নিয়েছিলেন, দিকে-দিকে তাঁর আবির্ভাবের বার্তা ছড়িয়ে গিয়েছিল, তাঁর কালের সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁর রচনায় আর ব্যক্তিত্বে অভিভূত এবং প্রভাবিত হয়েছিল, তার ইতিহাস জানলে আজও আশ্চর্য হতে হয়। কবি এবং মানুষ হিসেবে তাঁর

নজরুল ইসলাম: কিশোর জীবনী—হায়াৎ মামুদ। প্রতীক প্রকাশন, ঢাকা। আটষট্টি টাকা।

অপ্রকাশিত নজরুল—আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা-৭। পঞ্চাশ টাকা।

জীবনকাহিনী কেবল ইউরোপের কতিপয় অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কবি-লেখকের কথা আমাদের স্মরণ করায়। আমাদের নিজের ইতিহাসে হয়তো মধুসূদনকে তাঁর পূর্বসূরী বলা চলে।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে গল্প লিখে নজরুল আত্মপ্রকাশ করেন। একুশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় "বিদ্রোহী" কবিতা—যা বাঙলা কবিতার এক মাইলস্টোন। "বিজলী" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হবার পর পত্রিকার সব কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। এক সপ্তাহের মধ্যে কেবল ওই কবিতাটি প্রকাশের জন্য "বিজলী" আর-একবার বের করতে হয়। তখনকার দিনের সবচেয়ে অভিজাত "প্রবাসী"তে কবিতাটি তারপর ছাপা হল। তারপর আবার "মোসলেম ভারতে"। ১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার এক অজ গাঁয়ে যে ছেলের জন্ম এক দরিদ্র পরিবারে, ১৯২২ সালে তাঁর তিনটি গ্রন্থ প্রকাশ পেল—গল্প, কবিতা আর প্রবন্ধের বই। কবিতার বই "অগ্নিবীণা" আর প্রবন্ধের বই "যুগবাণী" সেই বছরই সরকার বাজেয়াপ্ত করে। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সের এই কবিকে রবীন্দ্রনাথ "বসন্ত" গীতিনাটক উৎসর্গ করেছিলেন—একজন তরুণ সদ্য লিখতে শুরু করা কবির কাছে এ নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির চেয়ে অধিক সম্মানের বলে আজ বুঝতে পারি। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে জাতির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় অ্যালবার্ট হলে। সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। উপস্থিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯১৯ থেকে ৪২ : মাত্র তেইশ বছরের কর্মময় জীবনে নজরুল যা করে গেছেন, যা দিয়ে গেছেন তা যেন গল্পকাহিনীর মতন।

কবিতার এক নতুন ভাষা, আবেগ আর চেতনা এনেছিলেন তিনি। তা ছাড়া, আজ তাঁর বড়ো পরিচয় গীতিকার হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই বাঙালির গানের জগতের রাজা। রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি ছাড়া আর কোনো বড়ো গানের ধারা আজও গড়ে ওঠে নি এবং নজরুলগীতির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। কবিতা ও গান ছাড়া নজরুলের কর্মপরিধির অন্তর্গত ছিল পত্রিকা-সম্পাদনা। সাহিত্য ও সংবাদপত্র সম্পাদনায় তাঁর দান কম নয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক সাংবাদিকতায় তিনি একটা আদর্শ তৈরি করেছিলেন। বামপন্থী সাংবাদিকতার আদর্শ সে যুগে যাঁদের হাতে তৈরি হচ্ছিল মুজফ্‌ফর আহমেদ ছিলেন তাঁদের অগ্রগণ্য। আর নজরুল ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর সহযোগী।

এরকম এক কবির জীবনী রচনা করেছেন হায়াৎ মামুদ। জীবনীটি কিশোর পাঠকদের কথা ভেবে স্বচ্ছ সরল ভাষায়, অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে এবং সংক্ষেপে রচিত। নজরুলের বিস্ময়কর, বৈচিত্র্যময় জীবনের কথা যে-কোনো বাঙালি ছেলেমেয়ে কিশোর বয়স থেকে পড়ে যদি মানুষ হয় ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে তা তাদের প্রভূত কাজে লাগবে। বালক নজরুলের সংগ্রামী জীবন তৃতীয় বিশ্বের যে-কোনো দেশের ছেলেমেয়েদের কাছে সংগ্রামের প্রেরণা যোগাতে পারে। অজ গাঁয়ের গরিব ঘরের সামান্য একটি ছেলে কী করে অসামান্য হয়ে উঠল তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন লেখক। নজরুলের জীবনের নানা পর্যায়, তাঁর দুঃখ-দারিদ্র্য-সংগ্রামের-স্বীকৃতিলাভের নানা পর্ব লেখক পর-পর ছুঁয়ে গেছেন। বইটির সংক্ষিপ্ত পরিসরের জন্য কোথাও তিনি বিশদ করে বর্ণনার সুযোগ পান নি, কিন্তু জীবনের মূল সূত্রগুলিকে ঠিকভাবে গ্রথিত করতে পেরেছেন। এই জীবনীর বড়ো গুণ তিনি সেই যুগের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নজরুলকে রেখে জীবনের ঘটনাক্রম বর্ণনা করেছেন। কিশোরদের জন্য লেখা বলে রাজনীতির ব্যাপার বাদ দিয়ে দেন নি। যে প্রখর রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে কিশোর ও যুবক নজরুল বড়ো হয়ে উঠেছিল এবং যথাসময়ে সেই রাজনীতিতে যোগ দিয়ে মনুষ্যত্বের সাধনায় এগিয়ে-ছিল—হায়াৎ মামুদ তাঁর কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের তা ধরিয়ে দিয়েছেন।

বইটির নামকরণের ক্ষেত্রে আমার খটকা লেগেছে।

"নজরুল ইসলাম : কিশোর জীবনী" নামের মাধ্যমে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? বইটি নজরুলের শুধুমাত্র কিশোর-জীবন নিয়ে রচিত, না কি, কিশোর-বয়সী পাঠকপাঠিকাদের জন্য রচিত? "কিশোর-জীবনী" বলতে সাধারণত কিশোরকালের কথাই বোঝায়। কিন্তু তা তো নয়। বইটিতে যুবক এবং প্রৌঢ় নজরুলের জীবনকাহিনীও সমানভাবে রয়েছে। নজরুলের জীবন প্রসঙ্গে লেখক বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের নাম করেছেন। তাঁদের কারো নাম ঘটনাক্রমে এলেই লেখক সেই বিশেষ ব্যক্তির পরিচয় সংক্ষেপে তাঁর কিশোর পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন—যেন তা তাদের কাছে শুধু একটি নামমাত্র হয়ে না থাকে, ওই ব্যক্তির গুরুত্ব যেন তারা বুঝতে পারে। লেখকের এই ভঙ্গিটি আমার বেশ ভালো লেগেছে। যেমন, তিনি তারাশংকরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। এরকম এক জায়গায় প্রমথ চৌধুরীর কথা উঠলে তিনি তাঁর পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে যে, 'ডাকসাইটে পণ্ডিত ও বিখ্যাত সাহিত্যিক, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়।' আমার মনে হয় প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় দিতে প্রথম দুটি অভিধাই যথেষ্ট। তিনি যে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়, এ তথ্য না জানালেও ক্ষতি ছিল না। কারণ 'প্রমথ চৌধুরার পত্রিকা "সবুজপত্র"' একথাও বলা হয়েছে এবং এটাই প্রমথ চৌধুরীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। বরং বলা যেতে পারত তিনি বাঙলা চলিত ভাষার সাহিত্যে ব্যাপক প্রচলনের পুরোধা ছিলেন।

সৈনিক জীবন সাঙ্গ করে করাচি থেকে নজরুলের দেশে ফেরা এবং কলকাতায় বসবাস, সাহিত্যজীবনে প্রবেশ ও প্রসিদ্ধিলাভের পর্ব লেখক এই গ্রন্থে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে এই বই কিশোর-কিশোরীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটির শেষে 'ছড়ানো-ছিটানো তথ্যের মঞ্জরী' অংশটির সংযোজন উল্লেখযোগ্য।

নজরুল রচনা-সম্ভার প্রকাশের ক্ষেত্রে হরফ প্রকাশনী যে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করে নিয়েছে তা আরো সমৃদ্ধ করা তোলার পথে আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত "অপ্রকাশিত নজরুল" গ্রন্থটির প্রকাশ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বইটির প্রচ্ছদে বা নামপত্রে যদিও বলা নেই যে এটি এক পরিকল্পনার প্রথম খণ্ড, কিন্তু 'প্রবেশক' অংশ পড়ে জানা যায় যে এরূপ দ্বিতীয় একটি খণ্ড প্রকাশের যোগ্য রচনাসম্ভার প্রকাশকের করায়ত্ত—যা নিশ্চয় নজরুল-প্রেমীদের কাছে এই গ্রন্থ হাতে পাওয়ার মতোই আনন্দদায়ক সংবাদ।

সাধারণভাবে নজরুলের খ্যাতি কবি ও সংগীতকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর রচনাপঞ্জীর দিকে তাকালে দেখা যায় তিনি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতার অনুবাদ, সংবাদ, নাটক ইত্যাদি লিখেছেন। কোনো কবি-লেখকের জীবৎকালেই যে তাঁর সমস্ত রচনা তিনি প্রকাশ করে উঠতে পারেন তা সত্য নয়। বরং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় মৃত্যুর পরেই তাঁর রচনার বিশাল অংশ লোকসমক্ষে প্রকাশিত হয়। তাই কোনো কবি-লেখকের স্ব-কালের বা পরবর্তী কালের মুগ্ধ পাঠকের মনে এই আশা ও কৌতূহল থেকেই যায় যে, যা তিনি জীবৎকালে প্রকাশ করতে পারেন নি—সে ইচ্ছে করেই হোক বা প্রতিকূলতার দরুন—তা যেন উৎসাহী সম্পাদক ও প্রকাশকেরা অনুসন্ধান করে খুঁজেপেতে সংগ্রহ করে মুদ্রণযন্ত্রের সমীপবর্তী করেন। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি তো তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অবিরত প্রকাশিত হয়ে চলেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি, চিঠিপত্র বা জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের প্রকাশ আমাদের যারপরনাই বিস্মিত করেছে ও করে চলেছে। নজরুলের অপ্রকাশিত রচনাও—যা এই গ্রন্থভুক্ত—আমাদের কাছে কম বিস্ময়কর নয়। এই সংকলনের প্রকাশ যে নজরুল-গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ

করবে, তাঁর সংগীত ও সুরসৃষ্টি সম্পর্কিত ধারণায় নতুন আলো ফেলবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

গ্রন্থটিতে আধ্যাত্মিক বিষয়ের কিছু টুকরো রচনা, "সুর ও শ্রুতি" নামে উচ্চাঙ্গ সংগীত বিষয়ক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, কিছু কবিতা, ইসলামী সংগীত, ভক্তিগীতি, কমিক, নাটিকা ও হিন্দি চর্চার নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু আর সব-কিছুকে বাদ দিয়ে শুধু "সুর ও শ্রুতি"র পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্যই সম্পাদক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন। বাঙলা সাহিত্য তথা উচ্চাঙ্গ সংগীতের ইতিহাসে এই পাণ্ডুলিপির প্রকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন। নজরুল অনেক গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, কিন্তু তিনি কি ভারতীয় মার্গসংগীতের গভীর চর্চা করেছিলেন? মার্গ-সংগীতের জ্ঞান বিনা কি কারো পক্ষে একটা আলাদা গীতি-ঘরানার সৃষ্টি করা সম্ভব? নজরুল সম্বন্ধে অদ্যাবধি সকলের ধারণা তথা বিশ্বাস যে তিনি কোনো-দিনই গভীরভাবে মার্গসংগীত চর্চা করেন নি, তাঁর চঞ্চল বহুমুখী জীবনে সে সুযোগই ছিল না। এই প্রচলিত ধারণা আমূল নস্যাৎ করে দেয় "সুর ও শ্রুতি" নামের বিশদ রচনাটি। মনে হয় শাস্ত্রীয় সংগীত বিষয়ে এ যেন কেবল সংগীতচর্চাতেই নিযুক্ত কোনো ওস্তাদের লেখা। কবিপ্রতিভাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি যে এমন গভীরভাবে শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে বই লেখার সাহস করতে পারেন, ভাবা যায় না। নজরুল-গীতি-প্রেমী ও গবেষকদের কাছে এই বইটি নিশ্চয় আদরণীয় হয়ে উঠবে এবং তাঁরা এ নিয়ে উপযুক্ত আলোচনা শুরু করবেন। আর যাঁরা সাধারণত উচ্চাঙ্গ সংগীত ভিন্ন অন্য কোনো গান করেন না, তাঁদের কাছেও বইটি স্বমহিমায় আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। সংকলনটিতে মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি এবং তার মুদ্রিত রূপ ছাপা হয়েছে।

'আধ্যাত্মিকতা' অংশে নজরুলের অধ্যাত্মচেতনার কিছু স্বাক্ষর ছাড়া অপ্রকাশিত যেসব কবিতা আর গান ছাপা হয়েছে তা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। নেহাত অপ্রকাশিত কবিতার প্রকাশ ছাড়া নজরুলের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে এগুলি নতুন কোনো সংবাদই দেয় না। টুকরো-টুকরো আধ্যাত্মিক রচনাগুলো অধ্যাত্মবোধহীন কিন্তু রসগ্রাহী যে কারোরই পড়তে ভালো লাগবে। এগুলোর মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু দিক আছে। বুঝতে পারা যায় এগুলি নিছক এক কবি বা ভগবদ্‌বিশ্বাসীর অসংলগ্ন চিন্তা-মাত্র নয়, বরং এক প্রখর জ্ঞানী পুরুষ তথা মনীষীকে চিনতে পারা যায়। ধর্মে মুসলমান হলেও নজরুলের ধর্মচিন্তা কখনো শুধু ইসলাম ধর্মের চর্চায় সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর 'ঈশ্বরতত্ত্বে' তিনি

জল = জিবরাইল = ব্রহ্মা
অগ্নি = মিকাইল = বিষ্ণু
বায়ু = ইসরাফিল = মহেশ্বর
} superintending angels

এইভাবে মিলিয়েছেন।

ভূমিকায় সম্পাদক অযথা নজরুলের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে টানাটানি করেছেন। আজ এত বছর বাদে নজরুল যখন বাঙালির হৃদয়ে রক্তে মিশে গিয়েছেন তখন তিনি কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন সেই প্রশ্ন তোলা বা প্রমাণ করতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। শেকসপীয়র বা গ্যটে ক্রিশ্চান ছিলেন কিনা, আমাদের জানার কোনো প্রয়োজন নেই। নজরুল ছিলেন বাঙালি (বাংলাদেশি নয়—বাঙালি) এবং হিন্দুমুসলমানের ঊর্ধ্বে আন্তর্জাতিক মানবতার কবি—তাঁর এই পরিচয়ই যথেষ্ট এবং শেষ পরিচয়। আধ্যাত্মিকতার দিকে তিনি এক সময় ঝুঁকেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে তাঁকে কোনো বিশেষ ধর্মমতে বিশ্বাসী বা ধর্মাবলম্বী বলে চিহ্নিত করার দুর্মতি যেন আমাদের না হয়।

ভূমিকার 'সংগীতজ্ঞ নজরুল' অংশে সম্পাদক এইরকম আরো কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য করেছেন। তিনি বারবার গান রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে টেনে এনে নজরুলের সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছেন এবং বলতে চেয়েছেন যে নজরুলও কিছু কম যান না। রবীন্দ্রনাথ বাইশ শ গান রচনা করেছিলেন প্রায় ষাট বছর ধরে অথচ নজরুল মাত্র তেরো বছরে প্রায় পাঁচ হাজার গান লিখেছিলেন (এবং রেকর্ড করেছেন), অতএব—সম্পাদক কী বলতে চেয়েছেন সহজেই অনুমান করা যায়। এমন মূল্যবান একটি গ্রন্থের ভূমিকায় এ ধরনের হালকা মন্তব্য শ্রুতিসুখকর নয়। কিন্তু অপ্রকাশিত নজরুলকে আমাদের গোচরে আনার জন্য সম্পাদকের উদ্যম সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

তন্ত্রশাস্ত্র এবং সঙ্গীত

সুলেখা আচার্য

সঙ্গীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে তাল, যা দেহের মধ্যে সৃষ্টি করে নৃত্যলহরী; আর গীত ও বাদ্য তো সঙ্গীতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু হীরেন বসু মহাশয় সঙ্গীতকে তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে এক ভিন্ন রূপের জগৎ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তিনি গানের সাতটি স্বরকে (সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি) আলাদা-আলাদা করে তন্ত্রশাস্ত্রের মূলধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেখাতে চেয়েছেন যে, 'বিশ্বের সমস্ত সুরই এক সূত্রে বাঁধা।'

"ফিলজফি ইন ইনডিয়ান মিউজিক" গ্রন্থে শ্রীবসু দেখিয়েছেন—তন্ত্রসাধনার দ্বারা মানুষ নিজের ভেতরে যে সুপ্ত-শক্তি আছে, তাকে জাগ্রত করতে পারে। এবং বসু মহাশয় এই গ্রন্থে বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন যে সঙ্গীতের সাহায্যেও সেই সুপ্ত-শক্তিকে জাগ্রত করা সম্ভব।

সৃষ্টি সম্পর্কে প্রাচীন বিদ্বানদের ব্যাখ্যায় আমরা যা পাই, প্রথমে শ্রীবসু সেগুলির উল্লেখ করেছেন এবং তারপর সঙ্গীত মানুষকে কোন্ স্তরে উন্নীত করতে পারে, তা দেখিয়েছেন। সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয় সৃষ্টির ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জগৎ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্থবির, তন্দ্রাভিভূত। এই অবস্থাকে তন্ত্রে বলে "অর্ধমাত্রা", যোগে বলা হয় "সমাধি", আর সঙ্গীতের ভাষায় বলা হয় "চিরশূন্যতা"। এইরকম এক সময়ে জগৎ-সৃষ্টি-কর্তার ইচ্ছে হল তিনি এক থেকে বহু হবেন। তাঁর নাদ বা প্রণবে (ওঁ) সৃষ্টি হল কম্পনের, কম্পন থেকে হল জগৎ-রচনা। নাদ থেকেই সৃষ্ট শব্দব্রহ্ম ও সুরব্রহ্ম। তন্ত্রে বলা হয় শব্দব্রহ্ম থেকে বিশ্বময় শব্দের উৎপত্তি এবং আকাশ হল শব্দের গুণ; কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আকাশ থেকে শব্দের উৎপত্তি হয়; আকাশ হল শব্দপ্রকাশের মাধ্যম মাত্র। নাদই জাগতিক সমস্ত বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করছে (সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, গ্রহ, সমুদ্র, নদী ইত্যাদি)। তন্ত্রে বলা হয়, 'যাহা নাই দেহভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।' দেহকে বলা হয় ত্রিনদীর সমাহার অর্থাৎ আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে রয়েছে তিনটি নালী—তন্ত্রের ভাষায় এদের বলা হচ্ছে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মাঝখানে রয়েছে সুষুম্নাকাণ্ড—সুষুম্নাকাণ্ডের বামে রয়েছে ইড়া এবং ডানে রয়েছে পিঙ্গলা। কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করাই হল মানবজীবনের ধর্ম। বলা হয়ে থাকে, সাপ যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোয়, ঠিক তেমনই আমাদের শক্তি ঘুমিয়ে থাকে মূলাধারে। মূলাধার বলতে বোঝায় মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ (lowest part of the spinal-cord)। এই মহাশক্তিকে জাগ্রত করাই হল তন্ত্রসাধনার লক্ষ্য। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হওয়া বলতে বোঝায় বায়ু যখন স্থির হয়ে সরলভাবে ঊর্ধ্বগতি হয়। স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস গ্রহণকে রেচক ও পূরক বলে এবং নাসিকার অভ্যন্তরে তাদের সমীকরণ করলে সাম্যভাব হয়। শ্বাস এবং প্রশ্বাসের গতিকে নাসিকার মধ্যে স্তব্ধীভূত করে রাখলে সুষুম্নার দ্বার খুলে যায় এবং যখন ইড়া, পিঙ্গলা ক্রিয়াশীল থাকে তখন সুষুম্নার পথ বন্ধ থাকে। সুষুম্নার দ্বার খুললেই কুণ্ডলিনীশক্তি অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্ধ্বমুখী হয়। তখন, দেহ, মন,

Philosophy in Indian Music by Hiren Bose. Rupa, 15, Bankim Chatterjee Street, Cal-73. Rs. 60

প্রাণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলি কেন্দ্রগত হয় ও কুণ্ডলিনীর ধারায় মিশে যায়। ক্রমে-ক্রমে সেই শক্তি সহস্রারে অর্থাৎ মস্তিষ্কে এসে মিলিত হয় এবং জীবভাব ও শিবভাবের মিলন হয়। শিবকে আমরা তাই দেখি নিথর, নিস্পন্দ। তিনি সমাধিস্থ।

জগতের দিকে তাকিয়ে দেখলেও দেখি সেই একই প্রকাশ—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়; সৃষ্টিতে কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগান। ক্রমে তার ঊর্ধ্বগতি-প্রাপ্তি। অবশেষে তার সমাধি সহস্রারে। লয়ও বলা যায় একে। সৃষ্টির খেলা চলেছে উন্মেষ আর নিমেষের মধ্যে দিয়ে (evolution & involution)।

শ্রী বসুর মতে, মহাবিশ্ব এক ছন্দোময় লীলায় লীলায়িত। অসংখ্য বস্তু, কিন্তু সর্বত্র একটি ছন্দ। কোথাও তার ছেদ নেই। যেখানেই ছেদ, সেখানেই অনৈক্য। লেখকের মতে, আমরা এই মহাশক্তি কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে পারি সঙ্গীতের মাধ্যমে। সে কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আবেগ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বরনালী অবধি না পৌঁছয়, ততক্ষণ এই আবেগ উদ্দীপিত করতে থাকে সুষুম্নাকাণ্ডকে।

আমরা একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাই শিব শিঙা ব্যবহার করেন, বিষ্ণু শাঁখ এবং কৃষ্ণ বাঁশি। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, প্রত্যেকটি যন্ত্রই কিন্তু নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসকে আয়ত্তে আনতে সাহায্য করে এবং সঙ্গীতও এই শ্বাস-নিয়মনই করতে শেখায়।

—আমাদের পুরাণে বলে, পঞ্চপ্রকৃতির কথা—দুর্গা (সৃষ্টি), লক্ষ্মী (সম্পদ), সরস্বতী (জ্ঞান), গায়ত্রী (ছন্দ), রাধা (সমস্ত শক্তির আধার)। রা অর্থাৎ মুক্তি; ধা হল মা যিনি সযত্নে লালন করেন। অয়ন, যিনি রাধার স্বামী, তিনি হলেন বিপরীতমুখী হাওয়া এবং কৃষ্ণ যিনি লালিত হয়েছেন আনন্দের আলয়ে। তিনি তাই আনন্দময়। শ্রী বসুর মতে যিনি শ্বাস-নিয়মন করতে পারেন, তিনি কৃষ্ণ। রাধা-কৃষ্ণের মিলন আর কিছুই নয়। কুণ্ডলিনীশক্তির সহস্রারে মিলন। কৃষ্ণের বাঁশি সেই ঘুমিয়ে-থাকা শক্তিতে জাগ্রত করে মোক্ষের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

সঙ্গীত আমাদের মোক্ষের পথে নিয়ে যায়। মোক্ষ বলতে শ্রী বসু বোঝাতে চেয়েছেন পার্থিব জগৎকে ভুলে আনন্দসাগরে স্নান করা। সঙ্গীতের ছন্দময়, লীলাময় পরিবেশ আমাদের পারে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সেই পার্থিব বা জাগতিক দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে আনন্দে অবগাহন করাতে। তাঁর মতে এই অবস্থাই হল মোক্ষ বা মুক্তির অবস্থা।

পরিশেষে তিনি দেখিয়েছেন যে জন্মসূত্রে আমরা প্রত্যেকেই একটি নিজস্ব স্বর (celltune) পেয়ে থাকি (সা, রে, রে, গা, গা, মা, মাঁ, পা, ধা, ধা, নি, নি) সেই স্বর অনুসারে এক-একজনের প্রকৃতি হয় এক-এক রূপ। এবং জীবনে যখনই সেই সুরের ছন্দপতন ঘটে তখনই মানুষ হয় অসুস্থ। তিনি শরীরকে তিনটি ভাগে করেছেন, যথা, ঊর্ধ্ব-অংশ, মধ্য-অংশ, ও নিম্নাংশ। প্রতিটি অংশে আবার শরীরের কয়েকটি অংশ যথা ঊর্ধ্বাঙ্গে (মাথা, গলা, নাসিকা-নালী, বুক)—এইভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে মধ্য ও নিম্নাঙ্গের ভাগগুলিকে দেখিয়ে, সেই অঙ্গের উপর কোন্ স্বরের প্রভাব তা বিচার করে রোগনির্ণয় ও রোগ-নিরাময়ের উপায় বার করার চেষ্টা করেছেন।

নিঃসন্দেহে বইটি একেবারে ভিন্নধর্মী এবং সেই-সাথে সহজবোধ্য ও সুপাঠ্য। তবে কিছু কথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। জ্যোতিষবিচারে তিনি মহিলাদের ভাগ্যনির্দেশ করেন নি। তিনি কি তাঁদের অস্তিত্ব আলাদা করে স্বীকার করতে চান নি? প্রচ্ছদপটটিও তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তুকে মনে রেখে যথার্থভাবে রূপায়িত হয়েছে।

আমার বিশ্বাস যিনি এই বইটি পাঠ করবেন, তিনি সঙ্গীত-জগতের অধিবাসী না হলেও শুধু বইটিই তাঁকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে এক অন্য জগতে নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। সেদিক থেকে শ্রী বসুকে যথার্থই সার্থক বলতে হবে।

আলোচনা

পিছিয়ে থাকা সমাজে সমাজতন্ত্র গড়ে-তোলা

অক্ষয় কর্মকার

সমাজভাবনার বিকাশের ইতিহাসে উনিশ শতকের শেষার্ধ নতুন চিন্তায় সমুজ্জ্বল এক সময়। এই কালসীমায়

১. মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে ঠিক-ঠিক বুঝে নেওয়ার চেষ্টা দেখা গেছে;

২. দেখা গেছে—বাস্তব ইতিহাসের উপরে দাঁড়িয়ে সমাজপরিবর্তনের প্রক্রিয়াটিকে যুক্তিযুক্ত-ভাবে শনাক্ত করার প্রয়াস;

৩. সমাজবিপ্লবের অন্তর্লীন নিয়মগুলিকে একটি সুস্থির দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর সাধনা; এবং

৪. বিদ্যমান মূলধনশাসিত সমাজে যে ইতিহাস-নির্দিষ্ট, সমস্বার্থসম্পন্ন, সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি (সমাজ-তত্ত্বের ভাষায়—শ্রেণী) মৌলিক সমাজপরিবর্তনের মূল সাধক, সেই জনসমষ্টির চেতনায় এই সমাজ-বৈপ্লবিক দর্শনকে প্রোথিত করে দেওয়ার নানামুখী আয়োজনও ছিল এই সময়ে।

এই চারটিই ছিল এই যুগের প্রধান ঐতিহাসিক কাজ।

এই সময়সীমায় একটি বড়ো গণবৈপ্লবিক সংগ্রামও হয়েছিল: ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী মূলধনের শোষণ আর শাসনকে উপড়ে ফেলার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল। সংগ্রাম সফল হতে পারে নি, কিন্তু এর অভিজ্ঞতা সারা পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীকে এমন কিছু মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছিল যা স্থায়িভাবে তাদের বিপ্লবদর্শনে অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। সেই সংগ্রামকে আমরা ১৮৭১ সালের পারি কমিউন নামে চিনি।

ওই পঞ্চাশ বছর বিশ্বশ্রমিকশ্রেণীর মননে আর সংগঠনে প্রস্তুত হয়ে ওঠার যুগ।

দুই

বিশ শতক বিপ্লবের (এবং প্রতিবিপ্লবের) যুগ।

এই শতকে কয়েকটি দেশে সমাজবিপ্লব ঘটে গেছে: মূলধনের (এবং সামন্ততন্ত্রের) শাসন-শোষণ ছিল যেসব দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি, সেই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে উৎখাত করে শ্রমিকশ্রেণী ভিন্নধর্মী রাষ্ট্রের পত্তন করেছে।

সেইসব নতুন রাষ্ট্রের একনায়ক শ্রমিকশ্রেণী।

মূলধন-শাসিত-শোষিত দেশে যে শ্রেণীর হাতে মূলধন, তারা তাদের এক বা একের-বেশি পার্টির মারফত তাদের শ্রেণীর একনায়কতা বা স্বৈরকর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। সেই একই ভাবে, নতুন রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী তাদের একটিমাত্র পার্টির মারফত তাদের একনায়কতা বা স্বৈরকর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। সেইটাই স্বাভাবিক, সেইটাই সঙ্গত। মূলধনী শ্রেণীর একাধিক পার্টি থাকে কেন? তাদের শ্রেণীর সামাজিক-রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে। শ্রমিকশ্রেণীর একটিমাত্র পার্টি থাকে কেন? তাতেই তাদের শ্রেণীস্বার্থের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটে বলে। বহু পার্টির অস্তিত্ব কি গণতন্ত্রের একমেব লক্ষণ? কদাচ নয়। একটিমাত্র পার্টির শাসনেও গণতন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হতে কোনো তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক বাধা থাকার কথা নয়।

নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলার পর, এই-সমস্ত দেশে বৈজ্ঞানিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব এসে পড়ল শ্রমিকশ্রেণীর কাঁধে। বস্তুত, বৈজ্ঞানিক-সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার জোর, জরুরি ঐতিহাসিক তাগিদ থেকেই শ্রমিকশ্রেণীকে একান্তভাবে তার নিজকর্তৃত্বাধীন শ্রেণীরাষ্ট্র গড়ে

তুলতে হয়েছে।

মূলধনীদের রাষ্ট্রের মতোই শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রেরও একদেহে দুই রূপ—প্রতিপালক আর সংহারক। মূলধনী রাষ্ট্র প্রতিপালন করে মূলধনের শোষণ আর শাসনকে; দমন-পীড়ন আর সংহার করে তাদের, যারা এই শোষণ-শাসনকে ধ্বংস করতে সংঘবদ্ধ। সেইভাবেই, শ্রমিকরাষ্ট্র প্রতিপালন করে সমাজ-তন্ত্রকে; দমন-পীড়ন আর সংহার করে তাদের, যারা সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করতে উদ্যত।

প্রত্যেক সমাজবিপ্লবই জন্মলাভ করে নতুন-পুরনোর মধ্যে দয়াহীন ক্রোধোদ্দীপ্ত সুতীব্র সংঘাতের ভিতর থেকে, অন্তিম ক্রান্তির বিন্দুতে পৌঁছে। তাই ধ্বংস, রক্তপাত, মৃত্যু প্রত্যেক সমাজবিপ্লবের নিত্য-সঙ্গী। প্রলেতারীয় বিপ্লবে সমাজের যে অধিঙ্গন শোষণমুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বিপ্লব করে, তারা হিংসার পথ থেকে দূরেই থাকতে চায়। শান্তিই তাদের পরম কাম্য। কেননা, সমাজকে মানুষের বাসের মতো করে সাজিয়ে তুলতে তারা উদ্‌গ্রীব। কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিপ্লবে যে শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত, তারা সম্ভব হয়ে উঠতে দেয় না। পরাজিত শ্রেণী পরাজয়কে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে চায় না। তারা এক সংগঠিত শ্রেণী, তাদের সামাজিক ভিত্তি এক ধাক্কায় চূর্ণ হয় না—তারা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচণ্ড প্রয়াস চালায়—হাতে অস্ত্র নিয়ে।

আপ্তবাক্য নয়—যুগ-যুগ ধরে এইটাই ইতিহাসের অভিজ্ঞতা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণী নতুন সমাজের নির্মাতা। তাই, কোটি-কোটি উৎপাদক মানুষকে অবমনুষ্যত্বের কুটিল-কঠোর অপমান-লাঞ্ছনা থেকে সুচিরকালের জন্য মুক্তি দেওয়ার দায় থাকে বলেই, শ্রমিকশ্রেণীর তরফে—অশ্রুপাত, রক্ত-পাত, মৃত্যু। এই অবস্থায় বিশুদ্ধ "মানবিকতা" চূড়ান্ত অবমানবিকতা। কবিতা আছে; 'নারীঘাতী শিশুঘাতী কুৎসিত বীভৎসা'-পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন।' সেই ধিক্কার যদি প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে, বঞ্চিত শোষিত অধিজনদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর পরম মমতা থেকে উৎসারিত হয়, প্রয়োজনে তা হিংস্র হতে বাধ্য। আক্রান্ত অধিজন প্রত্যাঘাত না করে করবে কী?

তিন

বিশ শতকের ঘটনাপ্রবাহ যেসব দেশের সমাজ-বিন্যাসে মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়ে দিল, তাদের আঙ্গিক গড়নটি ছিল কেমন? এটা দেখা দরকার।

লক্ষ করা যাচ্ছে—এইসব দেশের বেশির ভাগই ছিল সামাজিক বিকাশের নিরিখে অনেক পিছিয়ে-থাকা; মূলধনশাসিত সমাজের যেগুলি ইতিবাচক বা সদর্থক বা প্রগতিশীল উপাদান, সেগুলি এইসব দেশে সুপরিণতভাবে ফুটে ওঠার সুযোগ পায় নি; অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক—এই তিন ক্ষেত্রেই এই দেশগুলির অবস্থান ছিল বিকাশের সিঁড়ির অনেক-অনেক নীচের দিকে। বিপ্লবের আগের চীনে জাতীয় আয়ের শতকরা ৯০ ভাগই আসত কৃষি থেকে। শিল্প জোগাত মাত্র ১০ ভাগ। এইসব দেশে সাধারণ উৎপাদক মানুষের উপর ছিল তিন দিক দিয়ে শোষণ—সামন্ততন্ত্রের শোষণ, দেশিক মূলধনের শোষণ, সাম্রাজ্যতন্ত্রের শোষণ। এবং, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে, জাতিগত বঞ্চনা আর নিপীড়ন।

এই দেশগুলির একটি বিশেষ রূপের উপর দৃষ্টি-পাত প্রয়োজন—এগুলির প্রায় সব-কটিই ছিল কৃষকপ্রধান। এসব দেশে বহুস্তরে বিভক্ত কৃষক-সম্প্রদায়ই ছিল সমাজের অধিজন; যে জনসমষ্টি সবচেয়ে সংঘবদ্ধ, সমস্বার্থবোধ যাদের মধ্যে বিকশিত, মূলধনশাসিত সমাজের দুঃসহ অমানবিকতা (কেবল আর্থনীতিক বিচারেই নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিক বিচারেও বটে) যারা প্রতিদিনের উৎপাদন-

প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে মর্মে-মর্মে অনুভব করে, যারা সমাজপরিবর্তনের সবচেয়ে সক্রিয় কার্যসাধক, সেই শিল্পোৎপাদক শ্রমিকশ্রেণী সমাজে উনজন—কয়েকটি শিল্পশহরে কেন্দ্রীভূত। এটি পশ্চাদ্বর্তিতার একটি বড়ো পরিমাপক।

বিশেষ করে লক্ষ করা দরকার—বিশ শতকের ইতিহাস এইসব খুব-পিছিয়ে-থাকা দেশেই বিপ্লবের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দিল। অনেক-অনেক পিছনে থেকে, বহুকালের নিষ্পত্তি না হওয়া একাধিক সমস্যার সমাধান করতে-করতে, পুরনো সমাজের অনেকগুলি ভারী-ভারী বোঝা কাঁধে নিয়ে, এবং, সেগুলি এক-এক করে নামাতে-নামাতে, এইসব দেশের মানুষকে বৈজ্ঞানিক-সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ অচেনা পথে হাঁটা শুরু করতে হল। এই ঝামেলা এড়ানো গেল না—পোয়াতেই হল।

এই সত্যটিকে স্বীকার করা উচিত: পশ্চিম-ইয়োরোপীয় উন্নত মূলধনতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার পথে যেসব সমস্যার কথা কিছুটা পূর্বানুমান করা যায়, এইসব দেশে সেইসব সমস্যা অনেক জটিল দুরূহ হতে বাধ্য, অনেক সমস্যার সমাধান দীর্ঘায়িত বিলম্বিত হতে বাধ্য। ইতিহাসই এই জটিল বাধাগুলি তৈরি করে রেখেছে; মনের প্রবল আবেগ দিয়ে এগুলিকে তড়িঘড়ি কাটানো সম্ভব নয়। মনে রাখা উচিত: দায়টা কোটি-কোটি পুরনো মনের মানুষকে নিয়ে একেবারে আনকোরা নতুন এক সমাজ গড়ে তোলার। চীনের এক নেতা বলেছিলেন, পুরনো সম্পত্তিকে আমরা কলমের এক আঁচড়ে বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারি, কিন্তু পুরনো মনকে তো ওভাবে বাজেয়াপ্ত করা যায় না। অনেক দিন ধরে বুঝিয়ে বলতে-বলতে তাকে পালটে দিতে হয়। অসীম ধৈর্যের কাজ। ম্যাজিক দেখানোর অবকাশ একদম নেই।

কিন্তু অনেকের বাসনা: সমাজতন্ত্র ম্যাজিক দেখাক।

অনেককে এভাবে ভাবতে দেখা যায়—কোনো এক বিশেষ দিনে, লক্ষ লোকের উদ্বেল সমাবেশে, বিশেষ একজন মানুষ ঘোষণা করে দিলেন: আজ থেকে আমরা সমাজতন্ত্র গড়তে শুরু করে দিলাম—আর সেই মুহূর্ত থেকেই 'সকল দুয়ার আপনি খুলিল, সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল, সব বীণা বাজিল নব-নব সুরে।' এ ঘটনা কল্পস্বর্গে ঘটে, মর্ত্যের ধূলিমলিন মাটিতে ঘটে না। ইতিহাস এমন নিটোল ছন্দে হাঁটে না।

এই কথাটা চীনের এক বিপ্লবী নেতা বড়ো সুন্দর করে বুঝিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—এক-এক নির্দিষ্ট স্থানে-কালে ইতিহাস নির্দিষ্ট এক-একটি অভিপ্রায় সার্থক করতে চায়। মানুষই তার সাধক। ইতিহাস যে নির্দিষ্ট মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে, মানুষকে তার অভিনয়প্রতিভা ঠিক সেই মঞ্চের উপরই দেখাতে হবে। 'এ মঞ্চ আমার মনে ধরছে না' বলে সে পছন্দসই মঞ্চ বানিয়ে নিতে পারে না। এই মুহূর্তে ঘটনাচক্রে শাকভাতই যখন তোমার পাওয়ার কথা, ঠিক তখনই দুধভাত খাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠো না।

চার

এই দেশগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য—বলতে চাই নির্ধারক বৈশিষ্ট্য—লক্ষ করতেই হবে। সেটি হল: এসব দেশের মনোজগতে, সাংস্কৃতিক জীবনে, বৌদ্ধিক চর্চার ক্ষেত্রে মধ্যশ্রেণীর প্রায় একচ্ছত্র প্রাধান্য, প্রায় নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব।

মূলত এই শ্রেণীর মধ্যে থেকেই এসব দেশের বুদ্ধিজীবী (=বিদ্যাজীবী) সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এসব দেশের বৌদ্ধিক সাংস্কৃতিক জগতের যে অতি-সংকীর্ণ বিস্তার, তার দরুন, মধ্যশ্রেণী সমাজে তাদের বিশেষ অর্থনৈতিক সুযোগের কারণে, বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের সুফলগুলির সিংহভাগ ভোগ করে। এগুলি হতদরিদ্র, শিক্ষাবঞ্চিত, স্বাস্থ্যবঞ্চিত

শ্রমিকশ্রেণী আর কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যত পৌঁছতেই পারে না। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধির চর্চা, তত্ত্বের অনুশীলন অত্যন্ত খণ্ডিত; ফলে, প্রলেতারীয় বুদ্ধিজীবী-বিদ্যাজীবী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় এসব দেশে দুঃসম্ভব। ইল্যানডে বয়লার-শ্রমিক হ্যারি পলিট, ফ্রান্সে খনি-শ্রমিক মরিস তোরে নিজ-নিজ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হয়েছিলেন। এই নাম দুটি ব্যতিক্রম নয়। ওইসব দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলই এমন বিস্তৃত যে, প্রলেতারীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব আর বিকাশ বাস্তবত সম্ভব—যেটা পিছিয়ে-পড়া দেশে রাতারাতি সম্ভব নয়।

এই যেসব পশ্চাৎপদ দেশে ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরায় বিপ্লব ঘটে গেল, এখানে নগরবাসী আর গ্রামবাসী মধ্যশ্রেণীর মানুষ মূলে ছোটো সম্পত্তির মালিক। এদের একটা বড়ো অংশ কোনো মেটিরিয়্যাল ভ্যালুজ বা মূর্ত সামগ্রী উৎপাদন করে না—সামাজিক উৎপাদনপ্রক্রিয়া থেকে এরা বিযুক্ত। এরা একই সঙ্গে শোষণ করে, আবার শোষিত হয়। তাই দেখা গেছে, ১৯৪৬-৪৭ সালে অখণ্ড বাঙলায় যখন তেভাগা আন্দোলন চলতে থাকে, কমিউনিস্ট পার্টির মধ্য-শ্রেণীভুক্ত সদস্যদের বেশির-ভাগই এই আন্দোলনকে মনেপ্রাণে সমর্থন করে নি—ফসলের অর্ধেকের জায়গায় তিনের-এক ভাগ নিতে এদের বিষয়বুদ্ধি সায় দেয় নি। গ্রামে জমির মালিক হিসাবে এরা কৃষকের শোষক, স্থিতাবস্থার প্রতিপালক; শহরে জঙ্গি ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের সংগঠক—কারণ, সেখানে তারা শোষিত।

দ্বিতীয়ত, এই ক্ষুদ্র সম্পত্তির মালিকেরা কোনো অখণ্ড, অভগ্ন, সমসত্ত্ব (homogenous) শ্রেণী নয়—এদের মধ্যে একাধিক স্তর, উপস্তর। একটি বৃত্তচাপের ছবি চোখের সামনে রাখলে এদের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থান বুঝতে সুবিধা হয়। চাপের এক প্রান্তের মুখ মূলধনী-শ্রেণীর দিকে ফেরানো—একে বলা হোক দক্ষিণমুখিতা। বিপরীত প্রান্তের মুখ শ্রমিকশ্রেণীর দিকে—এর নাম হোক বামমুখিতা। মাঝখানে যারা, দুই প্রান্তের মধ্যে পেনডুলামের মতো তারা দুলতে থাকে। দোলাচলবৃত্তিই এদের স্বভাবধর্ম বা শ্রেণীধর্ম। এই দোদুল্যমানতাই এদের ঠেলে দেয় কখনো বিপ্লবের দিকে, কখনো স্থিতাবস্থার দিকে, অবস্থাবিশেষে প্রতিবিপ্লবের দিকেও। এক অবস্থায় এরা বিপ্লবের শিবিরে শামিল, আরেক অবস্থায় প্রতি-বিপ্লবের। স্মরণ করা যেতে পারে—হিটলারি ফ্যাশিজমের সামাজিক ভিত্তি ছিল সমাজের কোন্ স্তরের মানুষ। অনুসন্ধান করা যেতে পারে—আজকের ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতাবাদী-রাজনীতি ভিত্তি খুঁজে পায় কোথায়, কাদের মধ্যে।

বিপ্লবের দিকে এরা ঝোঁকে কখন? যখন বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক-মূলধনতান্ত্রিক সমাজে ছোটো সম্পত্তির মালিক হিসাবে এদের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে, একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার মুখোমুখি হয় এরা। তখন এরা মনে করে: বিপ্লবের শিবিরে শামিল হতে পারলেই আত্মরক্ষা করা যাবে।

কিন্তু, বিপ্লব যখন সত্যই আসন্ন হয়ে ওঠে, পুরনো সমাজের সমস্ত-কিছু হুড়মুড় করে যখন ভেঙে পড়ছে, নতুনকে আশ্রয় না করলে সমাজস্থিতি থাকেই না, তখন ওই একই যুক্তিতে—খুদে মালিক হিসাবে, সমাজের এক বিশেষসুবিধাভোগী শ্রেণী হিসাবে—পুরনো জীবনের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে, ব্যক্তি হিসাবে তো বটেই—শ্রেণী হিসাবেও উচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে, বিপ্লব-বিরোধী শিবিরে শামিল হয়। মনে করতে পারি রুশ বিপ্লবে অকটোবর-অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে সেই দুই খ্যাতনামা "গণতন্ত্রপ্রিয়" ব্যক্তির কথা—জিনোভিয়েভ আর কামেনেভ—যারা অভ্যুত্থানের দিনক্ষণ শত্রুপক্ষের পত্রিকায় প্রকাশ করে দিয়ে তাদের "গণতান্ত্রিক অধিকার" প্রয়োগ করেছিল।

এ আত্মরক্ষার তাৎপর্য—যে বিশেষসুবিধাপ্রাপ্ত জীবনে এত দিন তারা অবস্থিত, সেই জীবনকে নিশ্চিত করা।

কখন তারা স্থিতাবস্থাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়? সেই অবস্থায় যখন তাদের ব্যক্তিগত (এবং শ্রেণীগত) কামনা-বাসনা মোটের উপর চরিতার্থ হয়—শোষণের সুযোগ বজায় থাকে, সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি-মর্যাদা অটুট থাকে।

পাঁচ

পিছিয়ে-থাকা সমাজের এই মধ্যশ্রেণীকে আরও খুঁটিয়ে চিনে নেওয়া দরকার।

মানুষের মানুষতার সবচেয়ে নির্ধারক লক্ষণ কোন্‌টি?

সেটি এই যে, সে সমাজবদ্ধ হয়ে উৎপাদনকর্মে ব্যাপৃত হয়। কেননা, প্রকৃতিতে এইটিই তার প্রজাতি হিসাবে টিকে থাকার পূর্বশর্ত।

এই সামাজিক উৎপাদনশীলতার বিকাশের প্রয়োজনেই সে বিজ্ঞানের চর্চা করে—বিশ্বজগৎকে, তার বিচিত্র বস্তুপুঞ্জের ধর্মকে বুঝে নিতে চায়। কারণ, ওই প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জ থেকেই সে তার জীবনধারণের উপকরণ আহরণ করে।

সামাজিক উৎপাদন আর তার বণ্টনের অভিজ্ঞতা থেকেই সে সমাজের বিভিন্ন অংশগুলিকে চিনতে থাকে; নতুন-পুরনোর দ্বন্দ্ব, স্বার্থের সংঘাত সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে—সমাজের অস্তিত্বে আর বিকাশে কোন্ শ্রেণীর কি ভূমিকা; কে বর্তমানের মধ্যেই চিরকাল থিতু হয়ে থাকতে চায়, কে বিদ্যমানের বেড়া টপকে এগিয়ে যেতে চায়।

পিছিয়ে-থাকা সমাজে খুদে সম্পত্তির মালিক মধ্যশ্রেণী—

(ক) শ্রেণী হিসাবে সামাজিক উৎপাদনপ্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত; তাদের একটা বড়ো কাজ উৎপাদক মানুষের মাথার উপর বসে ছড়ি ঘোরানো;

(খ) এসব সমাজের সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত। ফলে, অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, মৌলিক বিজ্ঞান-গবেষণায় এই শ্রেণীর বিদ্যা-জীবীদের ভূমিকা নেহাত অনুকারকের—মৌলিক আবিষ্কারের কৃতিত্ব এরা অর্জন করতে পারে না;

(গ) সমাজে নতুন-পুরনোর দ্বন্দ্বে, প্রগতি-পশ্চাদ্-গতির সংগ্রামে এই শ্রেণীর বেশির-ভাগ মানুষ আগা-গোড়া একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, বরং বেশির-ভাগ সময়েই পুরনোর দিকে, অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

সমাজে এই যে এদের বিশেষ অবস্থান, এর থেকেই তৈরি হয়ে ওঠে এদের মনের গড়ন, চিন্তার ধরন। সে মন আত্মবৃত্ত, বস্তুবিমুখ। সে মনের মননের ধরন বিষয়িবাদী, বিষয়-অন্ধ। ঘটনার ধারার মধ্যে থেকে সত্যকে চিনে নাও—এ কথাটা এদের ধাতে সয় না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী অনুৎপাদক মানুষ, আর ব্যক্তিগতসম্পত্তিহীন উৎপাদক মানুষ, একজন বস্তুজগৎ থেকে বহু দূরে, আর-একজনের সর্বক্ষণ বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া, বস্তু থেকে সামাজিক সৃষ্টি—এই দুই জাতের মানুষের মনের গড়ন, চিন্তার ধরন, দুনিয়াকে দেখার চোখ কিছুতেই এক হতে পারে না। তফাতটা একেবারে গোড়া ঘেঁষে।

ছয়

মধ্যশ্রেণীর "বাম" মুখটিকেও ঠিকমতো চিনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে।

দুটি ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করা যাক।

(১) স্থান: সোভিয়েত ইউনিয়ন। কাল: ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ। অকটোবর বিপ্লবের পরের দশ বছরে যেসব কঠিন প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছিল, সেগুলি তখন মোটামুটি কাটিয়ে ওঠা গেছে। দেশের নেতারা মনে করলেন—সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সুসময় উপস্থিত।

শিল্পোৎপাদনে অব্যাহত সমাজতান্ত্রিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে, কৃষিক্ষেত্রেও মৌলিক রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন। নিতান্ত দেহশ্রমের ভিত্তিতে যে একক চাষবাস, তার জায়গায় ট্র্যাকটর, হারভেস্টার ইত্যাদি যন্ত্রসহযোগে ঐকান্তিক চাষবাস প্রবর্তন করার জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

যুগ-যুগ ধরে ছোটো-ছোটো জোত-চাষে অভ্যস্ত কৃষককুলকে এই ঐকত্রিক চাষের পথে আকর্ষণ করতে হলে, তাদের সামনে প্রত্যক্ষ নিদর্শন তুলে ধরা দরকার। তাই, সরকারি জমিতে গড়ে উঠল "শোভ-খোজ"—বিপুলায়তন জোতে আধুনিক কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে আবাদ করে তার সুফল কৃষকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল।

কৃষকরা ঐকত্রিক চাষের সুফল চাক্ষুস দেখলেন। যেসব জেলায় প্রধানত খাদ্যশস্যের ফলন হত, সেইসব জেলার কৃষকেরা ঐকত্রিক খামার "কোলহোজ" গড়ে তুলতে লাগলেন। কয়েক মাসের মধ্যে দেশের আবাদি জমির অর্ধেক অংশ "কোলহোজ"-এর আওতায় চলে এল।

কমিউনিস্ট পার্টির নীচের দিকের কর্মীরা (অবশ্যই মধ্যশ্রেণীভুক্ত) কল্পনাও করতে পারেন নি—সমবায় আন্দোলনে এত দ্রুত, এমন বিপুলভাবে সাড়া পাওয়া যাবে। এই সাফল্য তাঁদের মাথা ঘুরিয়ে দিল; তাঁরা ভাবতে লাগলেন: আমরা যা-ইচ্ছা-তাই করতে পারি। তাঁরা অহঙ্কারে ফেঁপে উঠলেন। রাতারাতি সম্পূর্ণ সাফল্য পাবার অস্থির তাড়নায়, তাঁরা কৃষক-দের ঠাণ্ডা মাথায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানোর পথ ছেড়ে, জবরদস্তি করে কোলহোজে ঢুকিয়ে দেওয়ার রাস্তা ধরলেন।

কিন্তু, দেশের নেতারা বিপদ বেশি দূর গড়াবার আগেই কর্মীদের তিরস্কার করলেন, বুঝিয়ে-রাজি-করানোর নীতিতে স্থির থাকতে বললেন।

যেটা মানুষের পক্ষে ভালো, সেটা এখথুনি, এই মুহূর্তেই, সবটা একসঙ্গে হাসিল করতে হবে: মানুষের মনের দ্বিধার তোয়াক্কা করা অবৈপ্লবিক—এইটা হল মধ্যশ্রেণীর "বাম"-মার্গীদের একটি চারিত্রলক্ষণ। অনেকে এটার নাম দিয়েছেন "তাড়াহুড়াবাদ"।

(২) ১৯৫৮ সাল নাগাদ চীনে "গ্রেট লীপ ফরোয়ার্ড" নামে একটা আন্দোলন উঠল। তার লক্ষ্য: রাতারাতি কৃষকদের সমবায়সংঘগুলিকে বৃহদাকার কমিউনে রূপান্তরিত করা। সক্ষম কৃষক-রমণীরা চাষের কাজে নেমে পড়লেন। ফলে, ঘরে-ঘরে রান্নাবান্নার পাট তুলে দেওয়া হল—মেয়েরা সাংসারিক কাজের একঘেয়েমি থেকে "মুক্তি" পেলেন। গ্রামে-গ্রামে গড়ে উঠল সমবায়িক রান্নাঘর।

ব্যাপারটা শুনতে খুবই ভালো—কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নানান জটিল সমস্যা দেখা দিতে লাগল। প্রতিদিন একঘেয়ে খাবার খেয়ে-খেয়ে বাচ্চা আর বুড়োদের মধ্যে নানান রোগ দেখা দিতে লাগল। কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ধোঁয়াতে লাগল। যে প্রবীণ কমিউনিস্টরা এই বিপদ সম্বন্ধে সজাগ করে দিতে থাকলেন, মধ্যশ্রেণীভুক্ত নবীন কমিউনিস্টরা তাঁদের গায়ে "দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া" ছাপ মেরে দিতে থাকলেন।

কৃষকদের অসন্তোষ যখন তুঙ্গে, তখনই এই প্রথা বাতিল হল।

এখানেও সেই একই কথা: স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করব না; যাদের ভালো করতে চাইছি, তাদের মতামতকে গ্রাহ্য করব না; যেটা ভালো, সেটা এখথুনি সবটা একসঙ্গে হাসিল করবই করব। এরা 'নিঠুর গরজি' এরা 'ফুল ফুটাবে গন্ধ দেবে সবুর বিহুনে'।

সাত

কমিউনিস্ট আন্দোলনের একেবারে শুরু থেকেই, মধ্যশ্রেণীর তরফ থেকে এই আঘাত—কখনো দক্ষিণ, কখনো "বাম"—অব্যাহত চলে আসছে। ক্ষমতা-দখলের আগেও, ক্ষমতা-দখলের পরেও।

মধ্যশ্রেণীর মানুষ সমাজের ভিতরেই আছে, বৈপ্লবিক শিবিরে তারা আসবেই, এবং নানান সময়ে নানান সমস্যা সৃষ্টি করে যাবেই। অথচ, এদের নিয়েই চলতে হবে।

এই মানুষদের উৎপাত মোটামুটি বন্ধ হবে কখন? কিভাবে?

এক: যখন খোদ শিল্পশ্রমিকদের ভিতর থেকে হাজারে-হাজারে বিপ্লবী তাত্ত্বিক, বিপ্লবী প্রচারক, বিপ্লবী সংগঠক উঠে আসবে—শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই বৈপ্লবিক নেতৃত্ব স্থিত হবে। যখন একদল বিচক্ষণ প্রলেতারীয় বুদ্ধিজীবীর অভ্যুদয় হবে।

দুই: এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, এই প্রক্রিয়ার প্রবল প্রভাবে, মধ্যশ্রেণীর অগ্রভাবুক মানুষদের মনের মৌলিক রূপান্তর ঘটবে, তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করবে—মধ্যশ্রেণীর অবস্থান ছেড়ে শ্রমিক-মানসিকতার সঙ্গে একাত্ম হবে।

এ পরিবর্তন রাতারাতি ঘটার নয়—আর, যত দিন তা না ঘটছে, তত দিন মাঝে-মাঝে ঝামেলা পাকাবেই। এক ফাঙ লিঝি যাবে, আর-এক ফাঙ লিঝি আসবে।

সাক্ষাৎকার

অন্তরঙ্গ অমিতাভ :

"শ্যাডোলাইন্‌স্"-এর লেখক অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়

অমিতাভ ঘোষকে নিছক ইঙ্গ-ভারতীয় ঔপন্যাসিক বললে তাঁর পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ইঙ্গ-ভারতীয় লেখক বললে যে দো-আঁশলা চেহারাটা মনে পড়ে, অমিতাভকে তার সঙ্গে একেবারেই মেলানো যায় না—ভারতবর্ষ তাঁর জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে। প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে ইংরেজিকে বাছলেও এই উপমহাদেশের নাড়ীর স্পন্দন ধরা পড়ে তাঁর উপন্যাসে।

অমিতাভর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় বিলেত থেকে, ১৯৮৬-তে। ভিড়ের মধ্য থেকে তাঁর একক বিশিষ্ট কণ্ঠস্বরটি চিনে নিতে বিদগ্ধ পাঠকের অসুবিধা হয় নি; "সার্কল অভ রিজন্" বুকার পুরস্কারের জন্য তালিকাবদ্ধ হয়েছিল। সার্কল-এর আখ্যানভাগটি অপ্রত্যাশিত, অতি স্বকীয়; শৈলীতে স্বপ্ন আর বাস্তবের মিশ্রণ। সব মিলিয়ে যেন এক আধুনিক অপুর জীবনপরিক্রমার সাগা : বিষণ্ণ, কৌতুক-কূজনে পরিপূর্ণ, এক গভীর জীবনবোধ ও অস্তিত্বিক চেতনায় ভাস্বর। সার্কল-এর নায়ক আলুর মাথায় আব, শৈশবেই অনাথ হয়ে সে আশ্রয় পায় নিঃসন্তান পিতৃব্যের কাছে। আদর্শবাদী এই স্কুল-শিক্ষক যেন বাঙলার উনিশ-শতকী নবজাগরণের শেষ প্রতিনিধি—বিজ্ঞানের যুক্তিতে অগাধ বিশ্বাস তাঁর, নিত্যসহচর লুই পাস্তুরের জীবনী। গ্রামের ভুঁইফোড় জোতদারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ তো অবশ্যম্ভাবী। এই বিরোধের সূত্র ধরেই বাস্তব আর স্বপ্নের আশ্চর্য আলকেমিতে কাহিনীর জাল বোনেন অমিতাভ, রুদ্ধশ্বাস গতিতে গল্প এগিয়ে চলে পাঠকের সমস্ত প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে। ডুরে-শাড়ি-পরা শ্যামলী এক তন্তুবায়কন্যার শরীরী মায়ায় আলু আকৃষ্ট হয়, পেশা হিসাবে বেছে নেয় তাঁত বোনা। স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে কাহিনী এগিয়ে চলে, মধ্যপ্রাচ্যের এক কাল্পনিক শহরে আলুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অভিনব সব মানুষ-মানুষীর। জিন্দি, কুলফী, জীবনভাই, মিসেস ভার্মা, ডঃ মিশ্র—অবিস্মরণীয় চরিত্র সব! শুধু বাঙলা বা ইংরেজি নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যেই এত বিচিত্র, বহুমুখী চরিত্র চিত্রণের দক্ষতা দেখিয়েছেন খুব অল্প কয়েকজনই। অমিতাভর আন্তর্জাতিকতা—বহু দেশ-ভাষা-মানুষ সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিপুল পুঁজি এবং তাঁর একান্ত, মগ্ন স্বাদেশিকতা, বাঙালিয়ানা—এ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। অক্সফোর্ড-শিক্ষিত এই কসমোপলিটন নৃতত্ত্ববিদের বিশ্ববোধ তাঁর নান্দনিক বীক্ষাকে এক অন্যতর মাত্রা দিয়েছে। আলজেরিয়া থেকে স্পেন হয়ে স্বদেশের পথে যখন আলু পাড়ি দেয় তখন লেখকের সঙ্গে পাঠকও অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এক সীমানাহীন বিশ্ববোধের মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে।

অমিতাভর দ্বিতীয় উপন্যাস "শ্যাডোলাইন্‌স্"-এর মধ্যে আরো তীব্র হয়ে উঠেছে এই বিশ্ববোধের আর্তি। পরিপ্রেক্ষিতে রয়েছে এই উপমহাদেশের গত কয়েক দশকের সাম্প্রদায়িক হানাহানির যন্ত্রণাকাতর, ম্লান আত্মপ্রতিকৃতিটি। কলকাতার একটি মধ্যবিত্ত বাড়ির পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা প্রিয়, পরিচিত একটি শৈশবের আবহে যখন সাম্প্রদায়িক মারদাঙ্গার এক ঝলসানো মুহূর্ত ঢুকে পড়ে ও তার সুদূরপ্রসারী শিকড়বিস্তারে অমিতাভ যখন সময়, স্বদেশ ও বিদেশকে এক নির্ভার শৈলীর দার্ঢ্যে বেঁধে ফেলেন, অস্বীকার করার উপায় থাকে না যে আমরা এক সত্যিকার ক্ষমতাশালী লেখকের মুখোমুখি হয়েছি। শৈলীগত বৈশিষ্ট্যে, ভাষার চমকপ্রদ কারুকাজে বিশেষত কাহিনীর সাময়িক বিন্যাস ও যতিতে মার্সেল প্রুস্তের তুলনা চলে আসা খুবই স্বাভাবিক। মানসিক মানচিত্রের প্রসারে তিনি তুলনীয় প্রাচীন এক বাঙালি কবির সঙ্গে। "শ্যাডোলাইন্‌স্"-এর অন্তিম অধ্যায়ে বাঙালি নায়ক যখন তার আত্মার দোসর হিসাবে খুঁজে পায় এক শ্বেতাঙ্গী বিদেশিনীকে তখন পাঠক অনুভব করেন যে কী অর্থহীন, অমানবিক এই পূর্ব-পশ্চিম, হিন্দু-মুসলিম, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ও সাদা-কালোর এই রাজনৈতিক তথা ধর্মীয় ছকগুলি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এক প্রাচীন বাঙালি কবির লেখনীতেই এসেছিল বিশ্ববোধের মাত্রা। আজকের বাঙালি ঔপন্যাসিক অমিতাভ আরেকবার প্রমাণ করলেন যে যথার্থ স্বাদেশিকতা ও বিশ্ববোধের মধ্যে সত্যিই কোনো বিরোধ নেই। "শ্যাডোলাইন্‌স্" এই বিশ্ববোধের অনন্য দলিল, "হিউম্যান ডকুমেনট"।

কাজের সূত্রে অমিতাভ সম্প্রতি কলকাতাবাসী। সঙ্গে সদ্যপরিণীতা বিদেশিনী স্ত্রী। বিবিধ প্রশ্ন নিয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলাম। অসঙ্কোচে অমিতাভ সেগুলির জবাব দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন সহানুভূতির সঙ্গে। সাক্ষাৎপ্রার্থী হিসাবে আমার মনেই হয় নি যে আমার সামনে বসে আছেন সদ্য-অকাদেমী-পুরস্কারপ্রাপ্ত একজন বিশ্ববন্দিত ঔপন্যাসিক। আতিথ্যে অভিভূত করেছেন ওঁর স্ত্রী, তিনিও লেখিকা। অমিতাভর সঙ্গে প্রায় দু-ঘণ্টা আলাপচারিতার প্রধান অংশগুলি প্রশ্নোত্তরের কাঠামোয় সাজাতে চেষ্টা করলাম।

অকাদেমী ছাড়াও অমিতাভ "শ্যাডোলাইন্‌স্"-এর জন্য এবছরের "আনন্দ পুরস্কার" পেয়েছেন।

প্রশ্ন—আপনার নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। আপনার জন্ম কি কলকাতাতেই?

উত্তর—হ্যাঁ, দক্ষিণ কলকাতায়, শরৎ চ্যাটার্জী রোডে।

প্র—লেখাপড়া?

উ—তারপর ঢাকায় ছিলাম। লেখাপড়া দুন স্কুলে। সেখান থেকে দিল্লী। দিল্লী স্কুল অভ ইকনমিক্স থেকে সোসিওলজিতে এম. এ. করি, তারপর একটা স্কলারশিপ পেয়ে অক্সফোর্ডে যাই। সেখান থেকে ফিরে এসে প্রথমে ত্রিবান্দ্রমে ও তারপর দিল্লীতে পড়াতাম। খবরের কাগজেও কাজ করেছি কিছুদিন। আপাতত কলকাতায়।

প্র—তার মানে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে, আমাদের বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ খুবই কম।

উ—এরকম প্রশ্ন নিজেকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করি নি। তা ছাড়া, যোগাযোগ তো মাপা যায় না, কম বা বেশি—এরকমও বলা যায় না। আচ্ছা, বঙ্গসংস্কৃতি বলতে কী বোঝেন?

প্র—সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। উদাহরণ দিতে পারি। ধরুন, এই রবীন্দ্রসঙ্গীত; এটা বঙ্গসংস্কৃতির একটা এলিমেনট।

উ—সংস্কৃতি অনেক রকমের হয়। ধরুন, একভাবে "পথের শেষে" একটা সংস্কৃতি থাকে……

প্র—না, সেরকম কোনো কালচারাল আয়কনের কথা বলতে চাইছি না। সংস্কৃতি বলতে একটা জ্যান্ত কোনো কিছু বোঝাচ্ছি—যাতে বাঁচি, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সেটা স্বাভাবিক……

উ—এরকম কোনো বিশুদ্ধ সংস্কৃতি আছে কি না আমি জানি না। ট্রানস্লেটারী কালচারটাও একধরনের সংস্কৃতি আর আমার তো মনে হয় বাঙালি সংস্কৃতিটা সেরকমই। ধরুন, বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের ভিক্টোরিয়ালিজম্ আছে, সংস্কৃতির ভেতরেই আছে। সেটা তো আসলে বিদেশী।

প্র—দেখুন, সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদানের ব্যাপারটা থাকেই, তা সত্ত্বেও একটি সংস্কৃতি তার বৈশিষ্ট্য হারায় না। তবে আজকের পৃথিবীতে বড়ো-বড়ো শহরগুলিতে একধরনের বিশেষ শ্রেণীর জন্ম

হয়েছে যারা সেই অর্থে কোনো সংস্কৃতিরই অন্তর্গত নয়—তারা ইয়াপি (yuppie)। তারা এক অর্থে এক আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির প্রতিভূ। তবে এটাকে "সংস্কৃতি" বললে কথাটার অপব্যবহার করা হয়। তাদের বাদ দিয়েই আমি এক-একটি কমিউনিটির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার কথা বলছি। এই স্বকীয়তার ব্যাপারটা বোঝা যাবে যদি অভিজ্ঞতার কথা ভাবি। একেবারে বাঙালি একটা অভিজ্ঞতার কথা বাঙলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় ঠিক বোঝানো যাবে না, কোনো বাঙালির কাছে তার যে বিশেষ অনুরণন সেটা থাকবে না……

উ—কই আমার তো সেরকম মনে হয় না। আমি মিশর বিষয়ে খানিকটা জানি, সেখানে থেকেওছি। এবার, মিশরের আজকের মধ্যবিত্তদের সাংস্কৃতিক চালচিত্রের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির খুব দূরত্ব আছে বলে মনে হয় না।

প্র—দুটো প্রায় একইরকম বলছেন?

উ—একেবারে একই রকম কি আর হয়, তবে কাছাকাছি। এবার প্রশ্নটা হল—আপনি কোন্‌টা দেখতে চান। মিল দেখতে চাইলে সেটা দেখতে পাবেন, আবার অমিল দেখতে চাইলে সেটাও পাবেন। আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপরেও ব্যাপারটা খানিকটা নির্ভরশীল।

প্র—আপনি তো পেশাদার অ্যানথ্রোপলজিস্ট। কথাটা খানিকটা সেরকমই হল বটে। অ্যানথ্রোপলজিস্ট ক্লীফোর্ড গীয়ার্ত্জ-এর একটা লেখা সম্প্রতি পড়ছিলাম। সেখানে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীটা উত্তরোত্তর ছোটো হয়ে আসছে, একই রকমের হয়ে উঠছে। 'এখানে' আর 'ওইখানে'র বিশেষ পার্থক্য আর থাকছে না। তার সঙ্গে-সঙ্গে অ্যানথ্রোপলজিস্টের ভূমিকাও পালটে যাচ্ছে। সেরকম কিছু বলছেন?

উ—হ্যাঁ, সংস্কৃতি ব্যাপারটা একটু বড়ো করেও ভাবা যায়।

প্র—ইংরেজিতে ভারতীয়দের লেখার প্রচেষ্টাটা কতদূর ফলপ্রসূ বলে আপনার মনে হয়? আপনাকে কী বলব—ইংরেজ না বাঙালি সাহিত্যিক?

উ—দেখুন প্ল্যাটিপাস বলে একজাতীয় প্রাণী আছে। সেটাকে পাখি বলা হবে, না অন্য কিছু বলা হবে, তা নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের বিস্তর মতান্তর আছে। এবার মজাটা দেখুন, এটা বিজ্ঞানীদের সমস্যা, তাঁদের তৈরি করা সংজ্ঞার সমস্যা, প্রাণীটার কিন্তু এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। আমি ইংরেজিতে লিখি এবং শুধু ইংরেজদের নিয়েই লিখি না, অন্যান্য চরিত্ররাও সেখানে থাকে। এবার এটাকে কিভাবে বুঝবেন, দেখবেন, বিশ্লেষণ করবেন—সেটা আপনার সমস্যা, আমার নয়।

প্র—আসুন, সমস্যাটা এইভাবে ভাবা যাক। ধরুন আপনি একজন বাঙালিকে নিয়ে ইংরেজিতে একটা উপন্যাস লিখবেন। এবার প্রশ্ন হল যে, বাঙালির অভিজ্ঞতার জগৎকে ইংরেজিতে ধরা যাবে কি না, গেলে কতটা যাবে। আর তা ছাড়া ভাষা ও অভিজ্ঞতা—এ দুটো বিচ্ছিন্ন নয়। অভিজ্ঞতার কনস্টিটিউটিভ এলিমেনটগুলোর মধ্যে ভাষাও একটা। এ সমস্যাটার কিভাবে সমাধান করবেন?

উ—সেটা খানিকটা ঠিক আবার কী ধরনের থিওরি অভ ল্যাঙ্গুয়েজ-এ আপনি বিশ্বাস করেন সেটার ওপরেও অনেকটা নির্ভর করছে। ধরুন, 'কড়াই' শব্দটা। এটার তো কোনো ইংরেজি নেই। কিন্তু আমি কি এমন কোনো বই লিখব যাতে 'কড়াই' একটা সেনট্রাল জিনিস হবে?

প্র—কিন্তু ভাষা তো একটা সেনট্রাল জিনিস…

উ হ্যাঁ। কিন্তু ভাষা সম্পর্কে আপনার মতামতটাও গুরুত্বপূর্ণ। সেভাবে ভাবলে ইউরোপের মধ্যযুগের সাহিত্যের একটা বড়ো অংশকেই বাদ দিতে হয়। ল্যাটিন নিশ্চয়ই মধ্যযুগের সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনের ভাষা ছিল না। অথচ ল্যাটিনে সাহিত্য হয়েছে এবং সেগুলো আমরা এখনও সাহিত্য হিসাবেই পড়ি।

প্র—সেজন্যই ল্যাটিন সাহিত্য খানিকটা কৃত্রিম। তারপরই মাতৃভাষায় লেখালেখি শুরু হল, রনেসাঁসের সাহিত্যের একটা বড়ো দিক হল যে এগুলো স্থানীয় ভাষায় লেখা।

উ—কিন্তু মাতৃভাষাটাই বা কী? অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি দেখি যে গোটা ফ্রান্স জুড়ে বহু আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে; এর মধ্য থেকে কৃত্রিমভাবে একটা ফরাসি ভাষা তৈরি হল এবং রাষ্ট্র প্রায় সবার ওপর সেটা জোর করে চাপিয়ে দিল। সেটাই সাহিত্যের ভাষা হল এবং তাতে সুসাহিত্যও সৃষ্টি হল।

প্র—কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক আপনি বাদ দিয়ে গেলেন। ফরাসিকে রাষ্ট্রভাষা করে তোলার সঙ্গে-সঙ্গে সত্যিকার ইতিহাসেও অনেক পরিবর্তন হল। এবং সে পরিবর্তন শুধু ভাষাগত নয়, সেই পরিবর্তনে সংস্কৃতিরও অনেক রদবদল হল। অনেকগুলো আঞ্চলিক সংস্কৃতি ভেঙে-চুরে একটিই জাতীয় সংস্কৃতি তৈরির চেষ্টা হল—বিপ্লবী উৎসবগুলি তার প্রমাণ। অতএব ফরাসিকে রাষ্ট্রভাষা করার সমান্তরালে অভিজ্ঞতার জগতেও অনেক টানাপোড়েন হল। তাছাড়াও, ল্যাটিন বা ফরাসির সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর যে সম্পর্ক, ইংরেজির সঙ্গে বাঙলার সে সম্পর্কও নয়। বাঙলা আর ইংরেজির মধ্যে শাসক-শাসিতের বিভাজনের অর্থাৎ একটা ক্ষমতার প্রশ্নও রয়ে গেছে। সেটা বোধহয় এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

উ—কিন্তু তার সঙ্গে ইংরেজিতে লেখার সম্পর্ক কী? ইংরেজিতে লেখা মানেই শাসকের পক্ষে যাওয়া? এ যুক্তি মানতে পারলাম না। এটা মানলে বলতে হবে যে আজকে যদি কোনো বাঙালি সাঁওতাল পরগনায় বসে সাঁওতালদের নিয়ে বাংলায় লেখে তবে সে শাসকের পক্ষের লোক।

প্র—উনিশ শতক থেকেই আমাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে, দেশপ্রেমের সঙ্গে, জাতি হিসাবে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে মাতৃভাষার প্রশ্নটি জড়িয়ে গেছে। সেই ইতিহাসটা ভুল বলতে চান?

উ—আপনার মূল প্রশ্নটা, অর্থাৎ পাওয়ার আর ল্যাঙ্গুয়েজের সম্পর্ক, সেটা ইনটারেস্টিং। তবে যদি বলেন যে ইংরেজিতে লিখলেই শাসকের পক্ষে যাওয়া হবে, সেটা অতিসরলীকরণ। অল রাইটিং ইজ অ্যান অ্যাক্ট অভ পাওয়ার। ভাষানিরপেক্ষে। আর উনিশ শতকে বাঙালিই সবচেয়ে বেশি করে ইংরেজি শেখার দিকে ঝুঁকেছিল।

প্র—আচ্ছা, লেখার আগে তো আপনার একটা চয়েস ছিল। ইচ্ছে হলে তো বাঙলায় লিখতে পারতেন। লিখলেন না কেন?

উ—এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। যদি বলি যে 'হ্যাঁ পারতাম, তবুও লিখিনি', তবে আপনি তার একটা বিশেষ অর্থ করবেন। আমার লেখার আগে আমি কী করতে পারতাম বা পারাতাম না, সে প্রশ্ন অর্থহীন। লেখার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই এই কথা বলাটা শুরু করেছি।

প্র—ভবিষ্যতে বাঙলায় লেখার কোনো পরিকল্পনা আছে?

উ—না, কোনো পরিকল্পনা নেই।

প্র—ইদানীং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন মাইনরিটিরা তাদের অধিকার ও স্বকীয়তা অর্জনের জন্য ভাষাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিচ্ছে। সাহিত্যেরও একটা জায়গা আছে তার মধ্যে…

উ—নিশ্চয়ই। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের উদ্যোক্তা সুভাষ ঘিসিং, নিজে একজন ঔপন্যাসিক। এটা কি আপনার আপত্তিক বলে মনে হয়? আসাম সংক্রান্ত আন্দোলনের শিকড় লুকিয়ে ছিল আসাম সাহিত্যসভার মধ্যেই। আর এসবের জন্য কী মূল্য আমরা দিয়েছি সেটা নিশ্চয়ই আপনাকে বলে দিতে হবে না। আর এই যে ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যের ধারণা, এটা নিছক একটা ইলিউশন অভ সেপারেটনেস্ ইন এ ল্যাঙ্গুয়েজ অফ সিমিলারিটি, সিমিলারিটি অভ ডিসকোর্স। দ্যাটস্ অল…

প্র—বাঙলা পড়েন ?

উ—খুব কিছু না। এই সেদিন পড়লাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "তোমার তুলনা তুমিই"। খুব ভালো লেগেছিল।

প্র—সুনীলদা-র "পূর্ব-পশ্চিম" পড়েছেন ? সেখানে সুনীলদা একটা গোটা উপমহাদেশের বাস্তবতাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। আপনার চেষ্টার সঙ্গে খানিকটা সাদৃশ্যও আছে।

উ—সম্প্রতি উপন্যাস একেবারেই পড়া হয়ে উঠছে না। সময় পাচ্ছি না। আমি যখন কলেজে পড়ি তখন বলা হত যে "জয়েস"ই উপন্যাসের শেষ কথা, "ইউলিসিস"-এর পরে নাকি উপন্যাস আর লেখাই যাবে না। সে সময়ই আমাদের হাতে মার্সেল প্রুস্তের লেখা এল। আমার মনে হয় যে প্রুস্তের মধ্যে যে সম্ভাবনাগুলো লুকিয়ে ছিল আজকের সাহিত্য সেগুলোকেই এক্সপ্লোর করছে। ধরুন মার্কোয়েজ-এর "ক্রনিকল্ অভ এ ডেথ ফোরটোল্ড"। আমার তো মনে হয় যে এটি প্রুস্তীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই জায়গা করে নিতে পারে। আমরা, আজকের লেখকরা, বিভিন্ন রকমভাবে প্রুস্তীয় ডাইমেনশন অভ মডার্নিজম্-কেই এক্সপ্লোর করছি।

প্র—অথচ দেখুন প্রুস্ত কী ভীষণ ফরাসি। প্রুস্ত অন্য কোনো ভাষায় লিখছেন এটা আদপেই ভাবা যায় না।

উ—সেটা মানলাম। কিন্তু মাতৃভাষা ব্যাপারটা যদি নিছক একটা অত্যাচার হয়ে দাঁড়ায়, একটা নিষেধাজ্ঞা হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমার পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ছৌ-নাচের শিল্পী যদি ব্যালেও শেখে তবে তাতে তো কোনো আপত্তির কারণ দেখি না।

প্র—সাহিত্যিক ছাড়া আজকের দিনের দার্শনিক বা চিন্তাবিদদের একটা বড়ো অংশই পৃথিবীজোড়া সাংস্কৃতিক হোমোজেনাইজেশনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। যোগাযোগের উন্নতির ফলে দেশগুলোর সাংস্কৃতিক সীমারেখা বিলুপ্ত হতে চলেছে। এই অস্বাস্থ্যকর বৈচিত্র্যহীনতা আমাদের সাংস্কৃতিক ও নৈতিকভাবে অসাড় করে তুলছে, মানুষ রোবটে পরিণত হচ্ছে।

উ—আমি সম্পূর্ণ একমত আপনার সঙ্গে। আমিও চাই যে বৈচিত্র্য বাড়ুক। তবে সঙ্গে-সঙ্গে এটাও ভাবা দরকার যে যাঁরা এই হোমোজেনাইজেশনের প্রসেসটার মধ্যে রয়েছেন তাঁরাই কেন এটার এত বিরুদ্ধে। দেখুন, আমি বেশ কিছুদিন মিশরের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছি। উনিশ শতক থেকেই মিশরের চাষী আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠাপড়ার তালে তাল মিলিয়ে চাষবাস নিয়ন্ত্রণ করেছে। অথচ তারা তাদের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা হারায় নি। সেটা কমে যাওয়া দূর স্থান, বরঞ্চ বেড়েছে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। আর তা ছাড়া, পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে কী করবে, সেটা ঠিক করে দেওয়ার আমি কে ?

প্র—এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। আপনার দ্বিতীয় উপন্যাস, "শ্যাডো লাইনস"-এ দেখতে পাচ্ছি যে নায়ক ও নায়কের মাসতুতো ভাই তাদের এক ইংল্যানড-প্রবাসী তুতো-বোনকে জোর করে হোটেলের ফ্লোরে নাচা থেকে বিরত করল। সেটা নিয়ে অনেক তিক্ততারও সৃষ্টি হল। পরে বলা হল যে প্রকাশ্যে ভদ্রঘরের মেয়েদের নাচাটা আমাদের 'জাতীয়' সংস্কৃতি সম্মত নয়। তাই কাজটা ঠিকই করা হয়েছে। এখন দেখুন, উনিশ শতক থেকেই 'ঘর' ও 'বাহির'—এ দুয়ের জন্য দু-রকম আচরণবিধির কোড বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম স্তম্ভ। ভূদেব মুখুজ্জের সামাজিক প্রবন্ধগুলো পড়লে এটা বোঝা যাবে। বোঝা যাবে, রবিঠাকুরের "ঘরে বাইরে" পড়লেও। কিন্তু সহজ যুক্তিতে এটা আমি বুঝতে অপরাগ যে জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে গুটিকতক নিষেধাজ্ঞার সমীকরণ কেন করব। স্বাতন্ত্র্য বলতে সদর্থক কিছু ভাবা যায় না ?

উ—আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝলাম না। যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে ওই ঘটনাটা আমার বইতে কেন রয়েছে, তবে বলব যে বাস্তবে এরকমটা হয়, তাই। যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন যে আমি নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার পক্ষে কি-না, তবে বলব হ্যাঁ, আমি বাধানিষেধের পক্ষে নই।

প্র—ইন্দো-আমেরিকান ফিকশনের বাজারে একটা প্রবণতা ইদানীং লক্ষ করা যাচ্ছে। বিদেশী লেখকদের লেখা বইয়ের বা তার অনুবাদের বাজার এখন বেশ রমরমা। এখন, এই লেখকদের অনেকেই বড়ো লেখক, ভালো লেখেন। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রশ্ন রয়ে যায়। বিদেশী লেখার বৈচিত্র্য নিয়ে, তাকে গ্রাস করে, গিলে ফেলেই কি আজকের ইংরাজি সাহিত্যের সমৃদ্ধি, ইংরেজি সাহিত্য কি তাহলে দেউলে ?

উ—কিন্তু শুধু এভাবে দেখাটাই কি ঠিক হবে ? ধরুন, আজকে আমি যখন ডিকেন্স পড়ি, সেটা কি আমার কাছে এক্সোটিকা নয় ? তবে কি বলব যে বাঙালি সংস্কৃতি ইংরেজ সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস শুষে নিচ্ছে ? এ পদ্ধতিটা মোটেই ঠিক নয়। বরঞ্চ আমার মনে হয় যে, এই কৌতূহল ভালো, স্বাস্থ্যকর। আজকে লেখার জগতে বিভিন্ন কণ্ঠস্বর আসুক, একে স্বাগত জানানো উচিত।

প্র—সাম্প্রতিক ইংরেজি সাহিত্যের কোন্ লেখকদের লেখা আপনার উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয় ?

উ—আমেরিকার কালো মেয়েদের লেখা আমার ভালো লাগে। আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইনডিজের লেখকদের লেখাপত্রও আমি পছন্দ করি। আমার সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাই।

প্র—একটা কথা প্রায়ই শুনি যে শিল্পকর্মকে ইমপার্সোনাল হতে হবে। আপনি এর সঙ্গে একমত ?

উ—সম্পূর্ণ ইম্পার্সোনাল কোনো উপন্যাস হতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

প্র—অথচ অনেক বড়ো-বড়ো ঔপন্যাসিক সেরকম দাবি করেছেন। ফ্লবেয়রের নাম তো করাই যায়। ইদানীং, ফরাসি 'নতুন উপন্যাস'-এর অন্যতম স্থপতি আলাঁ রোব-গ্রীইয়ের নামও করা যায়। তাঁর উপন্যাস তো সেরকমই। অবশ্য এর উলটোটাও বলা হয়েছে কখনও। বলা হয়েছে যে, উপন্যাস অভিজ্ঞতার ফসল, আত্মজীবনীমূলক, ইত্যাদি। লেখক হিসাবে আপনি কি বলেন ?

উ—দেখুন, উপন্যাস কখনই অঙ্কের মতো হতে পারে বলে আমার মনে হয় না, সে যে যাই বলুক না কেন। তবে এ-দুটোরই ভূমিকা আছে উপন্যাসে। আমার লেখাতে হয়তো দুটোই মিলে-মিশে আছে।

প্র—ইন্দো-আমেরিকান উপন্যাসের অবক্ষয় নিয়ে আজকাল বিস্তর কথাবার্তা হচ্ছে। পাঠক হিসাবে এবং লেখক হিসাবে আপনার কী মন্তব্য ?

উ—সাহিত্য সম্পর্কে আদপেই এরকম কিছু বলা যায় বলে আমার মনে হয় না। কেমিস্ট্রির এক বিশেষ ধরনের গবেষণা নিয়ে বলা যায় যে ওই ধারাটা শুকিয়ে যাচ্ছে, ওই ধারাটা অবক্ষয়ী, ইত্যাদি। কিন্তু সাহিত্য নিয়ে এটা বলব কী করে ? সাহিত্যিক লেখেন কারণ তিনি না লিখে থাকতে পারেন না, লেখা তাঁর নিয়তি, লেখা ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। লেখক হিসাবে আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি।

প্র—আপনার দুটি উপন্যাসেই বিস্তর ভায়োলেন্স। খুন, দাঙ্গা ইত্যাদি 'শ্যাডোলাইনস্'-কে তো সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী, দাঙ্গা-বিরোধী উপন্যাস বলা হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলাও রয়েছে তার মধ্যে। এটাও সত্যি যে, আজকে আমরা এদেশে ক্রমশ এক ভায়োলেনট সোসাইটির দিকে চলে যাচ্ছি। ঔপন্যাসিক হিসাবে আপনি কিভাবে রিঅ্যাক্ট করেছেন বা করছেন ?

উ—আমার প্রথম বই থেকে দ্বিতীয় বইতে একটা শৈলীগত পার্থক্য নিশ্চয়ই চোখে পড়বে। তথাকথিত 'ম্যাজিক রিয়ালিজম', প্রথম বইতে যেটা আমি

এক্সপ্লোর করেছি, এখন মনে হয় ওটা ভায়োলেন্সেরই একটা ফলশ্রুতি। ম্যাজিক রিয়ালিজম ইজ ভায়োলেন্ট রাইটিং ইট ইজ রুটেড ইন ভায়োলেন্স। এটা বোঝার পর, দ্বিতীয় বইটি শুরু করার আগে আমার সমস্যা হল ভায়োলেন্সকে নিয়ে কীকরে নন-ভায়োলেন্ট উপায়ে লেখা যায়। একটা উদাহরণ দিই। ল্যাবোরেটরিতে সবাই-ই ব্যাঙ কাটে। এটা ভায়োলেন্স। অথচ ওই বিশেষ অবস্থাটা ছাড়া, অর্থাৎ ল্যাবরেটরির এক্সপেরিমেনটের বাইরে একটা জ্যান্ত প্রাণীকে কাটাছেঁড়া করাটা খুবই অস্বাভাবিক। কেউই সেটা করবে না বা করলেও তাকে অসুস্থ বলে মনে করা হবে। এক্সপেরিমেনট ব্যাপারটা সেরকমই, সাহিত্যের এক্সপেরিমেনটও। যেহেতু এটা সাহিত্য এবং সাহিত্যে এক্সপেরিমেনট চলে অতএব ম্যাজিক রিয়ালিজমকে সবাই এক্সপেরিমেনট বলে মেনে নিচ্ছে। আজকের আধুনিক সাহিত্যে, ম্যাজিক রিয়ালিজম যাঁরা করেন তাঁদের সাহিত্যে তো বটেই, শুধু ধ্বংস আর নৈরাজ্য। আজকের আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেই যেন একটা অ্যাপোক্যালিপটিক ভিশন রয়ে গেছে। আমার দ্বিতীয় বইটাতে আমি এই অ্যাপোক্যালিপটিক ট্র্যাডিশন থেকে বেরুতে চেষ্টা করেছি।

প্র—আপনার প্রথম বইতে বাঙলার তাঁতবোনা নিয়ে অনেকটা লেখা রয়েছে···

উ—বিশ্বব্যাপী বড়ো-বড়ো ঘটনা ছেড়ে এটাতে এত উৎসাহী কেন জিজ্ঞেস করছেন? কারণ, এটা ছোটো ব্যক্তিগত। 'স্মল ইজ বিউটিফুল'।

প্র—আপনার লেখায় ভায়োলেন্স কিভাবে এল, কখন?

উ—"শ্যাডো লাইনস" লেখার কথা মাথায় আসে ১৯৮৪ সালে, দিল্লীর শিখবিরোধী দাঙ্গা চাক্ষুষ করার পর। তখন আমার মনে হয় যে, এদেশে এত দাঙ্গা হয়, পাবলিক ভায়োলেন্স হয়, ইয়েট দেয়ার ইজ নো স্পীচ ফর ইট্। দেয়ার ইজ নো পাবলিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইন হুইচ ইউ ক্যান রাইট অ্যাবাউট ইট। মনে করুন, একটা দাঙ্গা হল, লোক মারা গেল, কয়েকদিন কাগজে বড়ো-বড়ো হেডলাইন বেরুল। তারপর তার আর কোনো উল্লেখই নেই। আর যে ভাষায় দাঙ্গা নিয়ে লেখা হল কাগজে, সেটা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, শ্যালো, ঘটনার গুরুত্বর সঙ্গে অত্যন্ত বেমানান, অকিঞ্চিৎকর। ১৯৮৪-র দিল্লীর দাঙ্গাটার কথাই ধরুন। আমি তখন দিল্লীতে ছিলাম, পি. ইউ. ডি. আর করতাম। খবরের কাগজে এর উল্লেখ আর আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা—এ দুয়ের ফারাক খুব বেশি বলে আমার মনে হয়েছিল। অথচ কাগজে যারা চাকরি করে তাদের আমি জানি, নিজেও কাগজে কাজ করছি। দোষটা তাদের নয়, তারা আপনার আমার মতোই আদর্শবাদী, অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে। দে ল্যাক দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্য রাইট ল্যাঙ্গুয়েজ, এ পাবলিক ল্যাঙ্গুয়েজ টু রাইট অ্যাবাউট পাবলিক ভায়োলেন্স। সমস্যা ভাষার। আমার দ্বিতীয় বইতে আমি এই ভাষা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি, ভায়োলেন্সের স্মৃতি যাতে মুছে না যায় সেরকম এক ভাষা সৃজনের চেষ্টা করেছি।

প্র—তো, এক অহিংস সমাজের জন্য আপনার এই ব্যক্তিগত কোয়েস্ট, এটাকে বাস্তবে পরিণত করা বিষয়ে আপনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন।

উ—আমি কী ভেবেছি সেটা বলতে পারি। ধরুন ইউটোপিয়া ব্যাপারটা। ইউটোপিয়ার ধারণা থেকে ভায়োলেন্স আসতে বাধ্য। একটা ইউটোপিয়ান কমিউনিটির কথা মাথায় রেখে কাজ করলে তার ফলশ্রুতি ভায়োলেন্স। আমার প্রথম বইতে সেটা আমি লিখেছি। বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেনের 'অহিংস বিজ্ঞান'-এর ধারণাটা আমাকে অ্যাপিল করে। একটা মস্ত বড়ো বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা, একটা নির্দিষ্ট রাজনীতি, সংগঠন—এসব থেকে খুব কিছু হবে বলে মনে হয় না। ছোটো-ছোটো কাজে, ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাপনে অহিংসাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেটাই হবে সত্যিকার অহিংস সমাজের

দিকে অগ্রগতি।

প্র—ধর্মের এতে কোনো ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে হয়?

উ—ছোটো ছোটো ধর্মীয় গোষ্ঠীরাই এ পর্যন্ত এক অর্থে বিকল্পের সন্ধান দিয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার কথা ভাবুন। আজ বোধহয় শুধুমাত্র রাশিয়াতেই একটা সক্রিয় ধর্মীয় সমাজ রয়ে গেছে। এটা কেন হল? কারণ ধর্ম এখানে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র-তন্ত্রকে রুখতে সাহায্য করেছে, প্রতিরোধের বর্ম হয়েছে। রাশিয়ার একনায়কতান্ত্রিক জমানার সবচেয়ে ভালো ক্রিটিক এদের থেকেই এসেছে।

প্র—কিন্তু অনেক জঙ্গী ধর্মীয় গোষ্ঠীও তো রয়েছে।

উ—ওগুলো ধর্মের মুখোস, ভেক।

প্র—আজকে এ মুহূর্তে এদেশে দাঁড়িয়ে আমি অহিংস সমাজের কোনো সম্ভাবনাই তো দেখতে পাচ্ছি না। বরঞ্চ উলটোটাই হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। শান্তিপ্রিয় মানুষের সংগঠিত হওয়ার মধ্যে হয়তো কোনো সমাধান হতে পারে।

উ—জানি না। কিন্তু হিংসা দিয়ে হিংসাকে আটকানো, সংগঠন দিয়ে হিংসাকে আটকানো—এসব প্রচেষ্টা অতীতে হিংসাকে আশ্রয় করেই বৃহত্তর হিংসার দিকে এগিয়ে গেছে। ব্যক্তি ব্যাপারটা এখনও আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। এত দাঙ্গা, হানাহানি ও দেশভাগ সত্ত্বেও যে মানুষটির সীমান্ত পেরুতে কখনও কোনও অসুবিধা হয় নি তিনি হলেন খান আবদুল গফ্‌ফর খান। এরকম অনেক লোক থাকা দরকার। হিংসার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি হলেন এঁরাই।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ডি. রামস্বামী)

নাটক

"অলকানন্দার পুত্রকন্যা"

অভিনয় ও উপস্থাপনায় উজ্জ্বল নাট্যপ্রযোজনা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চগুলিতে বৃহত্তর জনরুচির পৃষ্ঠপোষকতামূলক সহজ লঘুসঞ্চারী কাহিনীর নাট্যরূপায়ণ দেখা যায়—যেখানে পরীক্ষানিরীক্ষার অবকাশ প্রায় নেই বললেই চলে। লক্ষ্য একটাই—কেমন করে সাধারণ মানুষকে ছকে আঁটা অশ্রুঝরঝর কিংবা হাসির ছররছর নাটক দেখিয়ে তৃপ্ত করে বিনিয়োগকৃত মূলধনের বহুগুণ প্রসার ঘটানো যায়। এরই বিপরীতে রয়েছে আরেকদল নাট্যসংস্থা যাঁরা প্রচলপ্রথামুক্ত, প্রয়োগ কৌশলে ও কাহিনীতে পরীক্ষানিরীক্ষার শ্রম স্বীকার করেন এবং বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ের গুণে বিদগ্ধমানসে উত্তীর্ণ হতে চান। "সুন্দরম্" প্রযোজিত "অলকানন্দার পুত্রকন্যা" এই দ্বিতীয় ধারার নাটক।

সন্তানসন্ততিহীন অলকানন্দা এই উপন্যাসের নায়িকা। প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় একটি মধ্যবিত্ত বাড়িতে কাহিনীর সূত্রপাত হচ্ছে—ক্লান্ত নায়িকা বাড়ি ফিরেছেন স্কুল থেকে। মঞ্চের একাংশে স্বামী রজনীনাথ অসুস্থ পঙ্গু—চা-স্পৃহায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন স্ত্রীকে ফিরতে দেখেই। আর্তনাদের মতো শোনায় তাঁর প্রথম সংলাপ—'আমি চা খাব'। দর্শকের বুঝতে দেরি হয় না যে তারা মুখোমুখি এক অসুস্থ মানুষের। সামান্য সংলাপের পুনরাবর্তনের মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে তা। অলকানন্দা নিজের সমস্ত স্নেহ উজাড় করে দিয়ে তিল-তিল করে পালন করেছেন শুভ আর মানসীকে। স্বামী রজনীনাথ সেই পালন-পোষণের সমান অংশীদার। আবেগ এবং প্রজ্ঞার সমন্বয়ে তৈরি রজনীনাথের চরিত্র। একদিন মানসীকে বাঁচাতে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তিনি, আর তারই পরিণতি পঙ্গুত্ব এবং আর্থিকভাবে নড়বড়ে হয়ে যাওয়া। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এই দম্পতির জীবনে নতুন ঝড় উঠল শুভকে নিয়ে। দুর্ভাগ্য তো একা আসে না—মানসীর স্বামীর পীড়নের সংবাদ পৌঁছে যায় অলকানন্দার কাছে। ধীরে-ধীরে নানা ঘটনার ঘনঘটায় নাট্যসংকট চরমে ওঠে এবং শুভ উন্মাদ হয়ে যায়। তারপরেই বিরতি। এবার নাটকের জট খুলে যায় এবং পরিণতির পথে এগোয়। প্রতিবেশিনী দেবাহুতির ভাঙা সংসারের জ্বালা ও শিশুপুত্রকে রেখে চলে যাওয়া যেন নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। নায়িকা অলকানন্দা সেই শিশুটিকে এবার স্নেহমমতার ঘেরাটোপে পালন করবেন—বড়ো করবেন—এমনি ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি। তখন ভোর হয়ে আসছে—জানালা খুলে দিতেই একরাশ আলো লাফিয়ে পড়ে ঘরের মেঝেয়।

নাট্যকার ও নির্দেশক মনোজ মিত্র নাট্যজগতে সুপরিচিত। নানা নাটকের নির্দেশনায় তিনি যে দক্ষতার পরিচয় ইতিপূর্বে দিয়েছেন তাঁর সেই সক্ষমতা এই নাটকে যেন আরো পরিণত। সংলাপের মধ্য দিয়ে সমকালের অনিশ্চয়তা আর টানাপোড়েন কেমন করে উন্মোচন করতে হয়, তা তিনি জানেন।

মূলত এই নাটক স্নেহবৎসল মমতাময়ী এক নারীর সামাজিক দায় পালনের কাহিনী। আপন গর্ভে সন্তান না এলেও জীবন যে ব্যর্থ হয়ে যায় না—এমনি এক গাঢ় সত্যভাষণের উপর নাটকটি দাঁড়িয়ে আছে—যেন এ পথেও 'আলো জ্বেলে মানুষের ক্রমমুক্তি হবে'। এই নাটক এমনি করে আশা ও বিশ্বাস জন্মে দেয়। এ হিসেবে এটি সদর্থক প্রযোজনা।

অলকানন্দার ভাই বাদল—সেই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মনোজ মিত্র। লেখা বাহুল্য, তাঁর অভিনয় চমৎকার। টানটান নাটকে হাসির রস ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি—লাঘব করেছেন দর্শকের সমস্যার বোঝা। এইসব চরিত্রকে অনেক সময়ই প্রক্ষিপ্ত মনে হয়—কাহিনীর সঙ্গে যোগসূত্র বড়োই ক্ষীণ থাকে। সুখের বিষয়—কোথাও-কোথাও অতিনাটকিয়তা সত্ত্বেও নিছক অভিনয়ের গুণে চরিত্রটিকে তিনি জুড়ে নিয়েছেন। তাঁর (বাদলের) অধ্যাপক পুত্র হিসেবে খুব সুন্দর মানিয়েছে সত্যব্রত দাসকে। উপযুক্ত চরিত্র পেলে অচিরেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন বলে মনে হয়েছে।

নায়িকা অলকানন্দার ভূমিকায় চিত্রা সেন এক কথায় অনবদ্য। তাঁর অভিব্যক্তি, বাচন, কণ্ঠস্বর বা সামগ্রিক উপস্থাপনা দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। আনন্দবেদনা, দুঃখবিষাদ মূর্ত করেছেন মুহূর্তেই। একটি অংশে তাঁর অভিনয়ের কলাকৃতি অসম্ভব ভালো লেগেছে। সেই যেখানে মানসীর চিঠি এসেছে—বাক্সে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন অথচ চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর বিমূঢ়তা, অশান্তি, অস্থিরতা আর উৎকণ্ঠা কী সুন্দরভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে তাঁর গানের গলার প্রশংসা করতে পারলাম না—বিশেষত নাটকের অন্য কুশীলবেরা যখন তাঁর সঙ্গীতকুশলতার স্তুতিতে পঞ্চমুখ।

রজনীনাথের চরিত্রে রঞ্জন রায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। একটি পঙ্গু মানুষের একাকিত্ব, স্নেহবাৎসল্য, রসিকতা কিংবা প্রেম সামান্য কয়েকটি সংলাপে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। শুভর ভূমিকায় সুব্রত চৌধুরীকে বেশ ভালো লাগে। দেবাহুতি এবং লেখক যুগান্তর শর্মার ভূমিকায় শর্মিলা মৈত্র ও দীপক ভট্টাচার্য যথাযথ।

আবহসঙ্গীত দেবাশিস দাশগুপ্তর। তাঁর কল্পনাশক্তির প্রশস্তি গাইতেই হয়—কোথাও তাঁর কাজকে আরোপিত মনে হয় নি। তবে নাটকের অন্তিমপর্বে অলকানন্দার মুখের রবীন্দ্রসঙ্গীত নেপথ্য আবহে বাজলে সুসমঞ্জস হত বলে মনে হয়েছে। মঞ্চপরিকল্পনা খালেদ চৌধুরীর। সুদক্ষ শিল্পীর নন্দনবোধ যথার্থ প্রতিফলিত হয়েছে। জয় সেনের আলোকপরিকল্পনায় মুন্সীয়ানা আছে।

"অলকানন্দার পুত্রকন্যা" আপাত সহজ সরল প্রযোজনা হয়েও অভিনয় ও উপস্থাপনার গুণে, বিন্যাসের ধারাবাহিকতায় দর্শকদের স্মৃতিতে বহুদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

মতামত

১

ভারতে গোবধ কি নিষিদ্ধ?

"চতুরঙ্গ"র এপ্রিল সংখ্যায় অধ্যাপক আহম্মদ শরীফ মহাশয়ের ক্ষুদ্রায়তন অথচ অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ "বিশিষ্ট সম্প্রদায় চেতনার গোড়ার কথা" প্রকাশ করার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, অধ্যাপক শরীফের বক্তব্যে এক উপমহাদেশের দীর্ঘ কালের ব্যাধি সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতি বিজ্ঞাননিষ্ঠ বীক্ষণ ও তার বিশ্লেষণের সঙ্গে-সঙ্গে এর সমাধান-সূত্রও নিহিত। "চতুরঙ্গ" যদি অধ্যাপক শরীফ ও তাঁর সমগোত্রীয় পণ্ডিতদের এজাতীয় আরও রচনা মাঝে-মাঝে প্রকাশ করে তবে এক অত্যন্ত মূল্যবান জাতীয়, আন্তর্জাতিক এবং সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করা হবে।

রচনাটি পড়ে অত্যন্ত উপকৃত এবং অনুপ্রাণিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে যে প্রশ্নটি মনে জেগেছে তা এই অবসরে অধ্যাপক শরীফের কাছে নিবেদন করি। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন: 'দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়েছে ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই। এর আগে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বা শাসক-শাসিতের মানস-দ্বন্দ্ব এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পীড়ন-বঞ্চনা সংঘর্ষ-সংঘাত ঘটাতে পারে নি।' কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব তাঁর বিখ্যাত "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ" প্রবন্ধে এই অভিমতের বিরুদ্ধে বলেন, 'স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে এদেশে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ মধুর ছিল ঐতিহাসিক সাক্ষ্য তার বিরুদ্ধে।' (শাশ্বত বঙ্গ; ব্রাক সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৩; পৃ ১৬৩)। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে ওদুদ সাহেব অতঃপর "সিয়ারুল মোতা আখেরীন" থেকে মোগল শাসনের শেষ ভাগে গুজরাট ও কাশ্মীরে সংঘটিত দুটি ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। ইংরেজদের নয়, এদেশীয়দের লেখা ইতিহাস থেকেও এজাতীয় আরও কিছু ঘটনার বিবরণ পাওয়া অসম্ভব নয়। অধ্যাপক শরীফকে বিনীত প্রশ্ন—এজাতীয় ঘটনার কোন্ ব্যাখ্যা তিনি দেবেন?

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বক্তব্যটি তথ্য সংক্রান্ত। রচনার শেষ ভাগে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'এ মুহূর্তে সেক্যুলার ভারত সরকারও "গোরু জবেহ" নিষিদ্ধ করেছেন হিন্দুদের আবদারে বা দাবিতে।' প্রথমত ভারতে গোবধ যে আদৌ নিষিদ্ধ নয় তার সাক্ষ্য দেবেন এদেশের হাজার-হাজার গোমাংসভোজী। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সংসদে সরকারের তরফ থেকে একাধিক বার জানানো হয়েছে এদেশ কত বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে গোমাংস রপ্তানি করে। তৃতীয়ত, কলকাতার ট্যাংরা, বোম্বাই-এর দেওনার এবং দেশের আরও অগণিত কসাইখানায় প্রত্যহ শত-শত গোবধ হচ্ছে—এ যে-কেউ গেলেই দেখতে পাবেন। ভারত সরকার গোবধ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা অবশ্যই করছেন এবং তা 'হিন্দুদের আবদার বা দাবিতে নয়' (এ জাতীয় দাবির অস্তিত্ব নেই তা নয়), নিছক আর্থিক কারণে এবং তার অনুপ্রেরণা আমাদের সংবিধানের (যা সেক্যুলার বলে অধ্যাপক শরীফ স্বীকার করেছেন) নির্দেশ। আর্থিক কারণটি হল—দুগ্ধবতী গাভী এবং কৃষিকার্যের সহায়ক বলদের হত্যা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা। যেদেশে মাথাপিছু দুধের সরবরাহ এখনও যৎকিঞ্চিৎ এবং যেদেশে বলদই চাষ এবং মালবহনের প্রধান সহায়ক—সেদেশে এমন প্রচেষ্টা যে অযৌক্তিক এমন অভিযোগ উঠবে না আশা করি। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে স্বল্প খরচের জীবন্ত সারের কারখানা (প্রদূষণের আশঙ্কারহিত এ সার যে রাসায়নিক সারের চেয়ে মাটির পক্ষে

অধিকতর কাম্য—এ এখন তর্কাতীত) হিসাবে গোরুর ভূমিকা এবং আর বিশ বছর পর বিশ্বের পেট্রোল ডিজেলের তাবৎ উৎসগুলি শুকিয়ে গেলে চাষের ট্রাক্টর ও মাল বওয়ার ট্রাক যখন আর চলবে না তখন বলদের যে ভূমিকা হবে, তার সম্বন্ধে দূরদৃষ্টি। তবে আরও অনেক সরকারি আইনের মতো এই আইনকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার উপায় আইনভঙ্গকারীদের জানা আছে। সুতরাং ভারতের কসাইখানাগুলিতে দুগ্ধদানের উপযুক্ত গাভী ও কৃষির উপযুক্ত বলদের জবাই হবার ঘটনা বন্ধ হয় নি। শুধু অধ্যাপক শরীফের মনেই ভারতে গোহত্যা সম্বন্ধে এই ভিত্তিহীন ধারণা নেই, কিছু দিন-পূর্বে বাংলাদেশের আর-একজন শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত বদরুদ্দীন উমর সাহেবের একটি রচনাতেও এই ভুল ধারণা চোখে পড়ল বলে প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করলাম।

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
"চারু-নীড়", কামডহরি, গড়িয়া
কলিকাতা ৭০০ ০৮৪

২

"ইসলামবিরোধী গানবাজনা" বলতে কী বোঝায়?

মে সংখ্যা "চতুরঙ্গে" 'সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি' শিরোনামে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে শ্রীদিব্যজ্যোতি মজুমদার লিখেছেন, 'মুর্শিদাবাদে মুসলমান চাঁই সম্প্রদায় ইসলামবিরোধী গানবাজনা করেন বলে নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা তাঁদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেন, প্রহার করেন, হত্যা করেন।'

একটু খটকা লাগল। মুর্শিদাবাদে চাঁই সম্প্রদায় আছেন। তাঁরা নিম্নবর্ণীয় হিন্দু। তাঁরা অপভ্রংশ মৈথিলী—আঞ্চলিক অপভ্রংশ বাঙলামিশ্রিত ভাষায় কথা বলেন। যেমন, 'তু ক্যায়ছন হাছস্?' (তুই কেমন আছিস)? এঁরা একসময় চাঁইমোড়ল (মহিলারা 'মোল্লান') বলে পরিচিত ছিলেন। প্রধান পেশা তরি-তরকারি বিক্রি এবং চাষ। এঁদের একাংশ নিজেদের 'ধানুকী' বলে জাতিপরিচয় দেন। চাঁইরা ক্রমশ সরকার এবং মণ্ডল পদবি গ্রহণ করেছেন। যাঁরা লেখাপড়া শিখেছেন, তাঁরা হিন্দুসমাজের একটা স্তরে মিশে গেছেন। চাঁইরা বাঙলাতেও কথাবার্তা বলেন। লোকনাট্য দল "আলকাপ"-এর প্রয়াত ওস্তাদ ঝাঁকসুর নাম ছিল ধনঞ্জয় সরকার। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তুলসী মণ্ডল শিক্ষিত মানুষ এবং চাঁই সমাজের উন্নয়নের জন্য সংগঠন গড়ে আন্দোলন করছেন। কারণ চাঁইরা না ঘরকা না ঘাটকা। এঁরা বিহার থেকে আসা আদিবাসী-হরিজন নৃগোষ্ঠীর মাঝামাঝি অবস্থান করতেন। সংবিধানের তফসিলে নাম ওঠে নি বলে হরিজন বা তফশিলিদের সুযোগসুবিধা পান নি। তুলসীবাবু ডাকবিভাগের কর্মী। বাড়ি জঙ্গিপুরের কাছে ধনপতনগরে। আমি "মায়ামৃদঙ্গ" উপন্যাসে ওস্তাদ ঝাঁকসু এবং চাঁই সম্প্রদায়ের কথা বলেছি। "নির্জন গঙ্গা" উপন্যাসে প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের চাঁই-সমাজের জীবন নিয়ে লিখেছি। বিহারে গঙ্গানদীর দুই তীরে এবং পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর দুই তীরে ও অববাহিকা জুড়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ চাঁই বসবাস করেন। প্রয়াত কালকূটও এঁদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন। এঁরা কোথাও-কোথাও "দিয়াড়ি" নামেও পরিচিত (ফার্সি 'দিয়ার' অর্থ নদীর চর)। মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে চাঁই, ধানুকী, দিয়াড়িদের উল্লেখ আছে। দিয়াড়ে বাস করেন বলে দিয়াড়ি।

বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। কথা হল, "মুসলিম চাঁই সম্প্রদায়" ব্যাপারটা কী তা হলে? 'ইসলামবিরোধী গানবাজনা' বলতেই বা কী বোঝায়? মুসলিম ফকির-আউল-বাউলরা (সুফি, দরবেশ, মাস্তান, নেড়ার ফকিরও উল্লেখ্য) কখনই ইসলাম-বিরোধী গানবাজনা করেন না। ইসলামের দার্শনিক

ধারা অসংখ্য। আসলে ঘটনাটা হল এরকম :

ওহাবি শুদ্ধি আন্দোলনের একটি ধারা বৃহত্তর বঙ্গে ফারায়েজি আন্দোলন হয়ে ওঠে। ফারায়েজি বা ফরাজি (ফারাজি বলা হয়)-মতে গানবাজনা নিষিদ্ধ। তাই ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি, গোঁড়া ফারাজিরা গানবাজনার বিরোধী। কিছু ক্ষেত্রে আউল-বাউল-নেড়ার ফকিরদের ওপর একটু-একটু চাপ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সেটা ব্যতিক্রম। আসলে কোথাও অত্যাচার হলে বুঝতে হবে, ধর্ম নয়; অন্য কোনও কারণ আছে। আমি ধর্মবিশ্বাসী নই এবং ধর্মকে বংশানুক্রম দুষ্টব্যাধি গণ্য করি। মুর্শিদাবাদে আমাদের খোশবানপুর গ্রামটি ফারাজি-অধ্যুষিত। কিন্তু বাউল আলকাপ, যাত্রা, নেটো, বন্দ্, একদিল পিরের গান, ইমামযাত্রা, বেহুলার পালা—সবই আসর করে হয়েছে। কেউ বাধা দেয় নি। এখনও দেয় না। কিছুকাল আগে বাউল ফকিরদের উপর মুর্শিদাবাদের গ্রামে বা বীরভূমের গ্রামে অত্যাচারের খবর কাগজে বেরিয়েছিল। তার পেছনে নিছক ধর্মীয় কারণ ছিল না। সরেজমিনে খোঁজ নিলে প্রকৃত কারণ বেরিয়ে আসবে। হয় নারীঘটিত, নয় সম্পত্তিঘটিত। ইদানীং এ ধরনের ঘটনা ফলাও করে ছাপা হয়। যেমন হয়েছিল শাহবানু মামলায়। শাহবানু মামলা নতুন কিছু নয়। অথচ এ নিয়ে তুমুল হইচই করা হয়েছিল রাজনৈতিক স্বার্থে।

মুর্শিদাবাদের এসব ঘটনা নেহাত চিরাচরিত ব্যতিক্রমী ব্যাপার। এখনও এ জেলায় ব্যাপক এবং মিলিতভাবে মুসলিম এবং হিন্দুদের আলকাপ, যাত্রা, পঞ্চরস, বেহুলার পালা অনুষ্ঠিত হয়। কেউ আসর পণ্ড করে না। কবিয়ালি তো আছেই। আছে ছড়াদারি গানও। দুঃখের বিষয়, শিক্ষিত শহরবাসী এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেশের মাটির ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই।

মুর্শিদাবাদের গ্রামে তথাকথিত মৌলবাদী মুসলিমদের সাম্প্রতিক কিছু তৎপরতার পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থ কাজ করছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে এঁদের প্রভাব নেই বললেই চলে। চিঠিতে বিস্তারিত বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। গত লোকসভা নির্বাচনে মুসলিম লিগ এবং বি. জে. পি-র ভোট কিছু বেড়েছে। তার কারণ কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট শরিকদের অন্তঃকলহ। ভোটের ফলকে রাজনৈতিক অভিমান বলা চলে। সাম্প্রতিক মফশশিল পুরসভাগুলির নির্বাচনী ফলাফল লক্ষ করলে প্রকৃত চিত্রটি স্পষ্ট হবে।

যাই হোক, শ্রী মজুমদারের ওই বাক্যটি আমাকে ধন্দে ফেলেছে। কবে, কোন্ গ্রামে এমন সোনার পাথরবাটি-ঘটনা ঘটেছে, আমি জানতে উৎসুক। সবিশেষ খোঁজখবর না নিয়ে কাগুজে সাংবাদিকদের উপর আস্থা যুক্তিযুক্ত নয়। অনেকের ধারণা, মুসলিম সম্প্রদায় খুব ঐক্যবদ্ধ। ধারণাটি ভুল। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড দলাদলি এবং অনৈক্য চিরাচরিত। খুনখারাপি লেগেই আছে। প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদের ঘটনা উল্লেখ্য। নিছক ধর্মীয় কারণে হাজার-হাজার মুসলিমের সমাবেশ ঘটে নি। সমাবেশের পিছনে ছিল হাজি মস্তান এবং দিলীপকুমার প্রমুখ চিত্রতারকাদের আগমনের গুঞ্জব। কিছু বুড়ো নিরীহ লোক অবশ্য নামাজ পড়তেই গিয়েছিল। তাদের সংখ্যা নগণ্য। মৌলবিদের ফতোয়ায় যদি কাজ হত, তা হলে নির্বাচনী রাজনীতির চেহারা অন্যরকম হত।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

৩

নিয়াজ মহম্মদ খান—টুকরো স্মৃতি

ফেবরুয়ারি মাসের "চতুরঙ্গ"-র সর্বশেষ পৃষ্ঠায় 'ভুল সংশোধন' শিরোনামায় একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো

হয়েছে যে অশোক মিত্রের আত্মজৈবনিক লেখায় 'নুর মহম্মদ খান' এই নামের জায়গায় ভুলক্রমে 'নিয়াজ মহম্মদ খান' এই নাম ছাপা হয়েছে। এই ভুল ছাপাটি নিয়ে কিছু লিখছি না। কিন্তু ভুলক্রমে হলেও নিয়াজ মহম্মদ খান-এর নামোল্লেখে আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের আগের কিছু কথা মনে পড়ে গেল। সে কথাই সংক্ষেপে লিখছি।

নিয়াজ মহম্মদ খানকে তখন আমরা এন. এম. খান বলে জানতাম। সম্ভবতঃ "এন. এম."-এর কারণেই "নুর মহম্মদ"-এর সঙ্গে গোলমাল হয়ে গেছে। নুর মহম্মদ-এর মতো নিয়াজ মহম্মদও আই. সি. এস. অফিসার ছিলেন এবং অশোক মিত্রের আগের কোনো ব্যাচেরই হবেন, কারণ অশোক মিত্র জানিয়েছেন যে তাঁর চাকরির প্রথম বছর ছিল ১৯৪০-৪১ ("চতুরঙ্গ", ফেবরুয়ারি, পৃষ্ঠা ৮৫২)। কিন্তু তার কয়েক বছর আগেই (সম্ভবত ১৯৩৫-৩৬ সালে) নিয়াজ মহম্মদ খানকে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার মহকুমাশাসক হিসাবে আমরা পাই। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মহকুমা-শাসক আগে বি.সি.এস.-এর লোকই হতেন। প্রথম আই.সি.এস. মহকুমা-শাসক হয়ে আসেন নির্মলকুমার রায়চৌধুরী (পরে হাইকোর্টের জজ হন)। অল্পদিন ব্রাহ্মণবেড়িয়াতে ছিলেন, কিন্তু প্রথম আই. সি. এস. মহকুমা-শাসক বলেই হোক বা তাঁর নিজস্ব চালচলনের জন্যই হোক, সেই অল্পদিনেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার পরই আসেন নিয়াজ মহম্মদ খান। পানজাবের লোক শুনেছিলাম, কিন্তু আকারে উচ্চতায় সাধারণ বাঙালি থেকে লক্ষণীয় তফাত কিছু চোখে পড়ে নি, তবে অবশ্যই অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই কর্মঠতার জন্যেই তিনি এমন দু-একটা কাজ করে ফেলেন যার ফলে তাঁকে স্থানীয় লোকরা অনেকদিন মনে রাখে। একটির উল্লেখ করি: তিনি একটা খাল কাটানোর কাজ হাতে নেন। কাজটি সম্পন্ন করার পদ্ধতিটির নতুনত্ব ছিল এই যে, তিনি সর্বস্তরের লোককেই একদিন গিয়ে মাটি কেটে আসতে হবে—এই নিয়ম চালু করে দেন। ফলে একসময় শিক্ষক, এমনকী উকিলদেরও মাটি কাটার পালা এসে যায়। গোলমালটি সম্ভবত বাধে উকিলদের মাটি কাটতে যেতে আপত্তি নিয়েই। একটু সাম্প্রদায়িক আবহাওয়াও সৃষ্টি হয়। শুনেছিলাম কুমিল্লার স্বনাম-খ্যাত আইনজীবী অখিলচন্দ্র দত্তকে পুরোধা করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস. এন. রায় (সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পরে বাংলা সরকারের মুখ্য সচিব)-এর কাছে কুমিল্লায় দরবারও করা হয় নিয়াজ মহম্মদ খানকে নিয়ে। সে যাই হোক, খাল কাটার কাজ অগ্রসর হবার পথে এক নতুন বাধার সৃষ্টি হয়। যে জায়গা দিয়ে খালটির জন্যে মাটি কেটে-কেটে যাওয়া হবে তার পথে পড়ে অবসরপ্রাপ্ত এক পুলিশ কর্মীর ('রোহিণী দারোগা'র) বাড়ির অংশবিশেষ। তিনি বেঁকে দাঁড়ান এবং নিয়াজ মহম্মদ খান-এর মতো একজন দুর্দান্ত মহকুমা-শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোতে ব্রাহ্মণবেড়িয়ার লোকের কাছে রাতারাতি হিরো বনে যান। শেষ পর্যন্ত অবশ্য খাল কাটার কাজটি নিষ্পন্ন হয়, এবং তার নাম রাখা হয় অ্যানডারসন খাল। স্যার জন অ্যানডারসন তখন বাঙলার গভর্নর ছিলেন। খুব সম্ভবত খালটির উদ্বোধন করতে গভর্নর নিজেই আসেন।

নিয়াজ মহম্মদ খান পরে অবিভক্ত বাঙালার স্বরাষ্ট্রসচিব এবং তারও পরে পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের মুখ্য সচিব হয়েছিলেন বলে শুনেছি।

কল্যাণকুমার দত্ত
কল্যাণী, নদীয়া